সপ্তকন্যার কাহিনী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—তিন টাকা চার আনা—

প্রচ্ছদপট : অহিভূষণ মালিক

কভার ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশান সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮, কর্ণও
স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রি

কুমারী আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়

সুচরিতাসু

এই লেখকের—

ইরাবতী (২য় সং)

উপকূল

আরাকান

অন্যতমা (২য় সং)

মৃত্তিকার রং

বহুচারিনী

প্রান্তিক

সুরবাহার

নারী ও নগরী

অবরোধ

বিনিময়

ঢেউ-খেলানো চুলে, টানা দুটি চোখে, নিটোল চিবুকের গড়নে আর শাঁখ-সাদা রংয়ে নিখুঁত রূপসী। চোখ তুলে দেখলে আর চোখ নামানোর কথা মনেই হয় না। কিন্তু ওই গোড়ালি পর্য্যন্ত। তারপরই খুঁতের শুরু। পায়ের পাতা দুটি সম্পূর্ণ ওল্টানো, শুরু-শীতের হাওয়া-লাগা মরা ডালের মতন শীর্ণ, নির্জীব। আজ বলে নয়, দীর্ঘ আঠারোটি বছর, মানে বাণীর জন্ম থেকেই।

বাপ নামী প্রফেসর। চোখ দুটো শুধু নোটবইয়ের পাতাতেই নিবদ্ধ নয়, আশেপাশের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ সজাগ। নয়তো এত কম সময়ের মধ্যে আড়াইতলা বাড়ি আর ব্যাঙ্কের মজুদ টাকার পরিমাণ এত বাড়াতে পারতেন না। মেয়ের পায়ে কম টাকা ঢালেন নি, কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালার সমানই হয়েছে। চমক লাগানো ডিগ্রির মালাপরা অস্থিবিদরা চেষ্টা করেছেন, শহরের নামকরা চিকিৎসকরাও, কিন্তু পায়ে ধরাই সার। পায়ের মোড় ফেরাতে কেউ পারেন নি। শেষে প্রফেসর হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাণীও তাই। চিনেবাড়ির গোল প্যাটার্ন ফরমায়েসী জুতো পায়ে দিয়ে স্কুলের বাসে গিয়ে উঠেছে। প্রবেশিকার বেড়া ডিঙোতে কোন অসুবিধা হয় নি, আই-এ পরীক্ষাতেও নয়, কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়তে হলো থার্ড ইয়ারে উঠে।

ভরা যৌবন। দেহের দুকূল ছাপিয়ে। কিন্তু ভরা জোয়ারে

পলিমাটি বয়ে আনাব মতনই প্রচুর মেদভার দেহের খাঁজে খাঁজে জড়ো হলো। বাহুমূলে, কটিতটে, নিতম্বে। অক্ষম পা দুটি নোটিশ দিলো। যৌবনভার সামলাতে দেবতাবাই হিমসিম খেয়ে যান, তো তুচ্ছ পদবল্লব। চলাফেরা দায়। দেয়াল ধরে ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা কিছুদিন। কিন্তু তাতেও অসুবিধা। গোড়ালি ফুলে ঢোল। ক্লাশে দু হাতে মুখ ঢেকে থার্ড ইয়াবেব ছাত্রী বাণী ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না, অথচ উপায় কি ?

এক উপায় সব ছেড়ে ছুড়ে বাড়িতে বসে থাকা। চলাফেরা না করা। কিন্তু সে তো মৃত্যুবই নামান্তব। আঠারোটি বসন্তের মালাকে অনাদৃত ফেলে বাখা ঘরেব এক কোণে। একটি একটি করে খসে খসে পড়বে কোমল পাপড়ি, শুকিয়ে বিবর্ণ হবে ফুলের রাশ। কোন কিছু কবাব থাকবে না, তা কি হয় !

বখাটে সহপাঠির দল যারা মুখের সামনেই বলতো, 'থির বিজুবী' কিংবা 'অয়ি মরালগামিনি !' তারাও ব্যাপার দেখে থেমে গেলো। পরিহাসেব পর্যায় ছাপিয়ে বেদনাব স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এ নিয়ে রসিকতা অমানুষিক।

প্রফেসব বাপ আবার তৎপর হলেন। প্রথমে মেয়েকে কলেজ ছেড়ে দেবার উপদেশ ! নড়াচড়া বন্ধ করলেই কমে যাবে পায়েব ব্যথা। বেশ কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। 'বেশ কিছুদিন নয়, অনন্তকাল', বাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো।

আবাব বড়ো, মাঝারী নানারকম ডাক্তাবের আনাগোনা

শুরু হলো। বিলাতফেরৎ থেকে আরম্ভ করে হাতুড়ে পর্যন্ত। অস্থিবিশারদ থেকে পাঁচনবিশারদ। পা ফেরাতে তো পারলেনই না, উপরন্তু মুখ ফেরালেন, 'একটু আগে ডাকতে হয়, হাড় যখন নরম ছিলো। এই শক্ত হাড়ে কখনও কিছু করা যায়?' অর্থাৎ নরম মাটি না হলে বেড়ালের আঁচড় সম্ভব নয়। কিন্তু হাড়ের যখন তুলতুলে অবস্থা তখনও চেষ্টা করা হয়েছে এমন কথার উত্তরেও তাঁরা মুখ বেঁকালেন, 'চেষ্টা করেছেন তেমনি ডাক্তারের কাছে।' এক কথায় সোনার বাউটি গড়াতে কামারের কাছে গিয়েছেন।

যখন প্রায় হাল ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা, তখন খবর আনলো সুনীতি সেন-জায়া। বাণীর সঙ্গেই পড়ে। আগে সুনীতি গুপ্ত ছিলো, মাসখানেক হলো সদ্য-পাশকরা ডাক্তার বিমল সেনের গলায় ঝুলিয়েছে নিজেকে, তা বলে গলগ্রহ নয়। কথায় কথায় ক্লাশে আনকোরা ব্যাধি আর টাটকা সব ওষুধের ফিরিস্তি। সহজ অসুখের বিদঘুটে যতো নাম। বাণীর ব্যাপারে এতদিন কোন আশ্বাসই দিতে পারে নি। কিন্তু এবারে শুধু আশ্বাসই নয়, অভয়বাণীও বয়ে আনলো। সোজা বাণীর বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বললো, 'নানারকম তো করলে, এবার একবার ডাক্তার ভাদুড়ীকে দেখাও।'

'ডাক্তার ভাদুড়ীকে?' বাণী পায়ের যন্ত্রণায় মুখ বেঁকালো। কিন্তু ভুল বুঝলো সুনীতি, 'ওই তো তোমার দোষ। সব কিছুতে মুখ বেঁকাও। ওদিক তো যথেষ্ট পয়সা ছড়াচ্ছো, একবার

কল দিয়েই দেখো না। দোষটা কি ?'

'দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না ভাই, তুমি একবার বাবাকে ডাক্তার ভাদুড়ীর ঠিকানাটা বরং দিয়ে যাও। কিন্তু এ ডাক্তারের তেমন নাম তো শুনি নি ?'

'প্র্যাকটিস শুরু করার আগেই নাম শুনবে নাকি ? দাঁড়াও ভালো করে বসতে দাও, সবে তো মাস দুয়েক ভিয়েনা থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছেন।' সুনীতি রুদ্ধনিশ্বাস।

'কিন্তু—' বাণী সন্দেহ করার মুখেই বাধা পেলো। সুনীতির গলা আরো জোর, 'সাতটি বছর ভিয়েনাতে এই কাজই করেছেন ডক্‌টর বনের তদারকে। ডক্‌টর বনের নাম নিশ্চয় শুনেছো ?'

বাণী শোনে নি। বাণীর বাপও নয়। কাজেই সুনীতিকে বিস্তারিত বোঝাতে হলো। বিখ্যাত আস্টয়োলজিস্ট। স্কিন গ্রাফটিংয়েও অদ্বিতীয়। সর্বাধুনিক ডাক্তারী জার্নালের রিপোর্ট সুনীতির কণ্ঠস্থ। সব শুনে প্রফেসরও ঘাবড়ে গেলেন। এত বড়ো জাঁদরেল একজন চিকিৎসক রয়েছেন হাতের কাছে অথচ তিনি কিছুই জানেন না। নিজের অজ্ঞতায় প্রথমে ম্রিয়মান, তারপর টেলিফোনের শরণ নিলেন।

মরা বিকেল। গাছে পাতায় একটা থমথমে ভাব। বত্রিশ ইঞ্চি ব্লেডের তলায় বাণী ঘেমে নেয়ে উঠছিলো। হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দুহাতে ভিজে জবজব চুলের গোছা জড়াতে গিয়েই থেমে গেলো। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পর্দার ওপারে ফিস-

ফিসানি, তারপরই বাপের গলা, 'বাণী।'

বেসামাল শাড়ি ঠিক করে নিয়ে বাণী উত্তর দিলো, 'এসো বাবা।'

কিন্তু শুধু বাপই নয়, বাপের পিছন পিছন মানানসই স্যুটপরা দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। ব্যাকব্রাশ চুল, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ, সুগৌর বর্ণ। ঠোঁটের গড়নে হাসি হাসি ভাব।

'ডক্টর ভাতুড়ী' প্রফেসর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার মেয়ে বাণী।'

ভাতুড়ী দু হাত তুলে নমস্কার করলেন। সপ্রতিভ হাসি, কিন্তু লজ্জা কাটিয়ে উঠতে বাণীর সময় নিলো। 'অমিয় মথিয়া কে বা লাবনি তুলিল গো, তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।' বার বার মনে পড়ে গেলো। পাশাপাশি আরো দু-একটা সংস্কৃত শ্লোক। এই ভাতুড়ী, বিখ্যাত অস্থিবিদ। এমন চেহারায় মন নিয়ে খেলা ছেড়ে শুধু হাড় নিয়ে নাড়াচাড়া। বাণী নিঃশ্বাস ফেললো।

ভাতুড়ী বিছানার পাশে এসে বসলেন। সন্তর্পণে বাণীর পা-দুটো টেনে নিলেন নিজের দিকে। অনেকটা যেন দেহি পদপল্লবমুদারম। নিস্তেজ শিরা, অস্পষ্ট পায়ের গোছ, কিন্তু তবু স্পর্শে শিহরণ। মেরুদণ্ডে তুষারের স্রোত। বুকে অশান্ত দাপাদাপি। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। দু-তিন রকম যন্ত্রের মাধ্যমে। তারপর পা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'একটু দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু চিকিৎসার বাইরে নয়। অভয় দিতে পারছি না,

তবে যদি বলেন একটা অপারেশন করে দেখতে পারি।'

'অপারেশন' ভয় থম থম গলায় আওয়াজ প্রফেসরের। বাণী কিন্তু মরীয়া। এমন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে এসপার্-ওসপার কিছু একটা হয়ে যাওয়াই ভালো। মরতেই যদি হয় তো ভাতুড়ীর কোলে মাথা রেখে, না হয় ওঁর অপারেশন টেবিলেই মরা ভালো। গুণ গুণ করে গানের একটা কলি মনেব কানাচে আনাগোনা করলো 'সে মরণ স্বরগ সমান।'

'আপনি দ্বিধা কববেন না, অপারেশনই যদি প্রয়োজন হয়, তাই হবে। আমি রাজী।' বাণীব গলা।

দ্বিধা! ভাতুড়ী ফিরে দাঁড়ালেন। তু-চোখে বিদ্যুতেব ঝিলিক। দ্বিধাহীন দৃষ্টি। অম্লান হাসলেন, 'বেশ তাই হবে। কিন্তু তাব আগে দিন কুড়ি আমাব চিকিৎসায় থাকতে হবে। হয়তো এ কদিন রোজই আমায় আসতে হবে একবাব করে।'

একবাব করে! সকাল-বিকেল আসলে হয় না, এত বড় একটা রোগ। বাণীর মনের ইচ্ছা অবশ্য তাই। কিন্তু প্রফেসর বাপের দিকে চেয়ে সামলে নিলো নিজেকে। দর্শন তো আর বিনা দর্শনীতে সম্ভব নয়। প্রফেসরেরও বোধ হয় এমন একটা কথাই মনে পড়ে থাকবে। তিনি ভাতুড়ীকে বল্লেন, 'চলুন ও-ঘরে গিয়ে সব ঠিক করে ফেলি। যদি অপারেশন করা প্রয়োজন মনে করেন, তাই করতে হবে।'

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত বাণী চুপচাপ বসে রইলো। যেটুকু রোদ ছিলো, ভাতুড়ী

বুঝি সেটুকুও মুছে নিয়ে গেলো। আবছা অন্ধকার। কোন-রকমে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো আর একবার দেখা যেতে পারে, কিন্তু উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা শুধু ব্যাধির নয়, আর একটা হাতের স্পর্শেরও।

প্রথম প্রথম রোজ, তারপর সত্য সত্যই ভাদুড়ী সকাল-বিকাল আসতে শুরু করলেন। একলা নয়, সঙ্গে নার্স। নার্স সঙ্গে রইলো বটে, কিন্তু নার্সের কাজ ভাদুড়ীই করতে লাগলেন। হাঁটু মুড়ে বসে বাণীব পায়ের পাতা দুটি টেনে নিয়ে ওষুধ মালিশ। খুব সন্তর্পণে প্রথমে, তারপর একটু একটু করে জোরে। শিরা সতেজ হবে, রক্ত-চলাচল স্বতঃস্ফূর্ত। মাঝে মাঝে কবোষ্ণ জলে স্পঞ্জ করাও চললো। দিন সাতেক এ সবের পরে তারপব ইনজেকশন শুরু হবে। এ যেন বলির পাঁঠাকে হাঁড়িকাঠে ফেলার আগে তরিবৎ।

গোড়ার দিকে ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রফেসর বাপও থাকতেন, কিন্তু কয়েকদিন পর তিনিও গা-ঢাকা দিলেন। সভা-সমিতি থাকে প্রায় রোজ বিকালেই, তাছাড়া ভাদুড়ী তো ঘরের লোক। পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে ভাদুড়ী মোলায়েম গলায় বলেন, 'আসতে পারি ?'

বাণী তৈরীই থাকে। তবু ইচ্ছা করে দেরী করে। আঁচলের খুঁট দিয়ে কপালের দু-পাশ আলোতে মুছে নেয়। এধারওধার পাউডারের প্রলেপ। ঘাড় ফিরিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের

আয়নায় নিজের ছায়ার ওপর চোখ বুলোয়। ভাগ্যিস আয়না-টায় শুধু কোমর পর্যন্ত ছায়া পড়ে, বাণীর অঙ্গের যেটুকু খুঁতহীন সেইটুকু। দুহাতে এলিয়ে পড়া খোঁপাটা জড়িয়ে নিয়ে মিহি গলায় বলে, 'বারে, আসুন।'

ভাদুড়ী ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে বসে পড়েন। হাতের ছোট ব্যাগ মেঝের ওপর রেখে বলেন, 'কই পা দেখি।'

'বাবা, বাবা'—কপট রাগে বাণী মুখটা আরক্তিম করে তোলে, 'মানুষটার কুশলপ্রশ্ন চুলোয় গেলো, কেবল পায়ের খোঁজখবর।'

ভাদুড়ী মুখ না তুলেই হাসেন, 'মানুষটা তো পায়ের ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। পা না সারিয়ে পদকর্ত্রীর কুশল জিজ্ঞাসা করার সাহস কোথায়?' কথা শেষ করে মুখ তুলেই ভাদুড়ী অবাক। আয়ত দুটি চোখ জলে টলমল। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ার আর দেরী নেই।

দু-একটা হাল্কা সান্ত্বনার কথা ভাদুড়ীর মনে আসে, সহানুভূতির ছিটে-দেওয়া আশ্বাসবাণী, কিন্তু সাহস হয় না স্তোক-বাক্যে রোগিণীর মত মন ভোলাতে। ছেলেমানুষ নয়। মিষ্টকথায় সব কিছু বোঝানো যাবে এ আশা করা ভুল।

বাণীই কথা বলে, 'আপনি সত্যি করে বলুন তো, পা আমার সারবে না। তাই না?'

মুখ তুলতে ভাদুড়ীর সাহস হয় না। পায়ের পাতার ওপর সন্তর্পণে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, 'আপনি নিজে বড়

নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। চেষ্টা করেই দেখা যাক না। এর চেয়ে অনেক কঠিন কেস ভিয়েনায় সারতে দেখেছি। মিস এথেল অ্যাগাস্থুরের ব্যাপার শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।'

এরপর সবিস্তারে এথেলের কাহিনী শুরু হয়। ডাক্তার বনের চিকিৎসায় কিভাবে একটু একটু করে বিদেশী মহিলা আরোগ্য লাভ করেন, তার অলৌকিক কাহিনী।

পলকহীন চোখ বাণীর। ভাদুড়ী যেন অস্থিবিদ নন, কথক। ইনিয়ে বিনিয়ে কুব্জার কাহিনী বলে চলেছেন অনবদ্য ভঙ্গীতে।

নানান ধরণের কথা। ইনজেকশন-দেওয়ার পরও ভাদুড়ীর ওঠার নামগন্ধ নেই। খাটের এপাশে বসে অনর্গল গল্প। 'জানেন আপনার পায়ের ওপর আমার কপাল নির্ভর করছে।' যন্ত্রপাতি হাতব্যাগে ভরতে ভরতে ভাদুড়ী অম্লান হাসেন।

'ওমা, ওকি কথা!'

'বিশ্বাস করুন। এদেশে এই আমার প্রথম কেস। যদি সারাতে পারি'—কথার মাঝখানেই ভাদুড়ী বাধা পান।

'যদি না সারাতে পারেন সেই কথাই বলুন আগে' আবছা অন্ধকারে চকচক করছে দুটি চোখের তারা, সাপের মণির মত।

ভাদুড়ী কিছু বলার আগে বাণীই উত্তর দেয়, 'খুব কড়া বিষ এনে দেবেন আমায়। ভয় নেই স্বীকারোক্তি রেখে যাবো, আপনাকে জড়াবো না।'

অনেক পরে ভাদুড়ী কথা বলেন। বাণীর উত্তেজনা স্তিমিত হবার পর।

'এত ছোট জিনিসকে এত বড়ো করে তুলছেন কেন। হাঁটু পর্যন্ত পা নেই দুনিয়ার এমন লোকও তো বেঁচে থাকে ?'

'তাকে আপনি বাঁচা বলেন ? সারাজীবন হুইল চেয়ারে বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকা। চমৎকার জীবন। হাড় নিয়ে কারবার মনের খবর আপনার জানবার কথা নয়।'

গরম জল হাতে নার্স ঢুকতেই বাণী থেমে যায়। থমথমে মুখের ওপর আঁচল টেনে দেয়। কিন্তু ফুলে ফুলে ওঠা দেহটা ভাদুড়ীর নজর এড়ায় না।

সকাল থেকে প্রফেসর মেয়ের কাছ ছাড়লেন না। প্রায় ভোর থেকেই রইলেন সঙ্গে সঙ্গে। এটা ওটা এগিয়ে দিলেন। খবরের কাগজ হাতে ছুটকো আলোচনা। দেশকালেব সমস্যা নিয়ে আলতো তর্ক। দু-একবাব হালকা পরিহাসেরও চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাণীর মুখ মেঘ-থমথম। খাটেব বাজুতে মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে বসে রইলো। হাজার ডাকে সাড়া নয়, একটি কথাও না।

'তোর যদি আপত্তি থাকে বাণী, তবে অপারেশন থাক না হয়', প্রফেসর ঝুঁকে পড়লেন মেয়ের দিকে।

বাণী মাথা নাড়ালো। না। এসপার নয় ওসপার। বালির চরের ওপর বসে থেকে ঢেউ গোণার জীবনের কোন মানে হয় না। ভয় বাণীর অন্য কারণে। সারবে যে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। একথা ভাদুড়ী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।, প্রফেসরকে

সামনে রেখে। কোন গ্যারাণ্টি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। চেষ্টা করবেন আপ্রাণ, না সারে তো অদৃষ্ট। তবু চেষ্টা করা একবার দরকার। বিজ্ঞান ঠকাবার যেমন ভান করে না, তেমনি জেতবার মিথ্যা আশ্বাসও দেয় না কাউকে।

কিন্তু তারপর। অপারেশন টেবিলে জেগে যদি বুঝতে পারে বাণী, ভাদুড়ীর মেহনতই সার। এ পঙ্গুতা যাবার নয়। তখন? বুকটা ধড়ফড় করে উঠতেই বাণী বালিশে বুক চেপে শুয়ে পড়লো। এমন কেউ নেই, পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে আলোর ইশারা আনে। মৃতজনে প্রাণ দেওয়ার প্রচেষ্টা।

ভাদুড়ী ঘরে ঢুকে রোগিণীর মুখ দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। বেশ নার্ভাস। আরক্তিম মুখে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটায়, দুটি চোখের তারায় সে ভাব স্পষ্ট। এমন অবস্থায় অপারেশন করাটা সমীচীন হবে না। শুধু ওষুধে আর ছুরিতে রোগ সারে না। রোগ তাড়াতে হয় মনের জোরে।

'কি ব্যাপার' ভাদুড়ী এগিয়ে এসে বাণীর কাছাকাছি দাঁড়ালেন। খুব কাছাকাছি।

বাণী মুখ তুললো। বুকের দ্রুত স্পন্দন হয়তো ভাদুড়ীর চোখে পড়ার কথা নয়; কিন্তু থরথর করে কেঁপে ওঠা দুটো ঠোঁট কতক্ষণ বাণী আঁচল আড়াল করে রাখবে!

'ভয় পাচ্ছেন নাকি?' ভাদুড়ী বিছানার এক পাশে বসে পড়লেন, 'আপনাকে তো আগেও বলেছি ভয় পাবার মতন এতে কিছু নেই।'.

বাণী হাসলো। ফিকে জ্যোৎস্নার মতন নিস্তেজ হাসি। 'মরার ভয় আমার ততটা নেই। পূর্ণচ্ছেদের পরে কিছু কল্পনা করতেও চাই না। কিন্তু জীবন্মৃত হয়ে থাকার কি বিড়ম্বনা সে আপনি বুঝবেন না।'

গুমোট গরম। বাতাসের ছিটে ফোঁটা নেই। জানলার ওপারে নিস্পন্দ কৃষ্ণচূড়ার ডাল। সিলিং ফ্যানের একটানা শব্দ। দু এক মিনিট সব চুপচাপ। তারপর ভাদুড়ী ঝুঁকে পড়ে বাণীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন।

'আশ্চর্য কেবল জীবনের অন্ধকার দিকটাই দেখবেন। আলোর আঁচড়ের দিকে চোখ ফেরাবেন না?'

বাণীর বুকের স্পন্দন দ্রুততর। হাতটা ভাদুড়ীর দুটো হাতের ফাঁদে ভীরু কপোতীর মতন কাঁপছে। খুব আস্তে অস্পষ্ট গলায় শুধু উচ্চারণ করলো, 'আলোর আঁচড়!'

'হ্যাঁ, বাঁচবার আশ্বাস। নীড় বাঁধার স্বপ্ন', কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হাত ভাদুড়ী রাখলেন বাণীর খুলে পড়া খোঁপার ওপরে। খুব সন্তর্পণে।

চোখ তুলে চেয়েই বাণী চোখ নামিয়ে ফেললো। জোনাকীর মতন জ্বলে জ্বলে উঠছে ভাদুড়ীর দুটি চোখ। সে দৃষ্টিতে কি নীড় বাঁধবার স্বপ্ন, দৃঢ় সংবদ্ধ দুটি ঠোঁটে বুঝি বাঁচবার অনন্ত আশ্বাস!

'বাণী।' আশ্চর্য, অস্থিবিশারদের গলায় মোলায়েম সুর। সব ভুলে বাণী ভাদুড়ীর দিকে ঝুঁকে পড়লো।

'তোমায় বাঁচতে হবে। নতুন করে জীবন শুরু করবো

আমরা। পুরনো সব কিছু ভেঙে নতুন জীবন।'

সেই মুহূর্তে বাণী ছোট ছোট সুখ দুঃখ পার হয়ে গেলো। নিজের পঙ্গুতাও। নতুন এক জগত। যেখানে দেহের অপূর্ণতা নেই, মনেরও। আর কোন ভয় নেই বাণীর। না-ই যদি সারে দেহের এ ব্যাধি, মনে কোন ক্ষোভ নেই। নির্ভর করার মতন এমন মানুষ যদি থাকে মনের কাছাকাছি, তাহলে কিসের অসুবিধা!

অপারেশনের দিন আরো এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেলো। এমন ভেঙে পড়া মন নিয়ে ছুরি কাঁচির ব্যাপারে না যাওয়াই ভালো। আরো দু-একটা ইনজেকশন চলুক। বাণীর কোন আপত্তি নেই। এক সপ্তাহ কেন, অনন্ত কাল পিছিয়ে যাক অপারেশন, শুধু পায়ে পায়ে ভাদুড়ী এগিয়ে আসুক। দেহের কাছেই নয়, মনেরও সান্নিধ্যে।

পায়ে পায়েই এগিয়ে গেলেন ভাদুড়ী। নিঃশব্দে। আচমকা পিছন থেকে বাণীর চোখ চেপে ধরলেন। পায়ের পাতা দুটোই না হয় নির্জীব কিন্তু যৌবনপুষ্ট শরীরটা তো আর নয়। সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমলো। অদম্য উন্মাদনা। একটা হাত দিয়ে বাণী আলতা ছুঁলো ভাদুড়ীর দুটো হাত। নিশ্চয়কে সুনিশ্চয় করে নেওয়া, তারপর মুচকি হেসে বললো, 'কে নার্স?'

ভাদুড়ী চোখ ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'নার্সের সাহস তো কম নয়?'

বাণী হাসি থামালো না, 'ডাক্তারের চেয়ে নিশ্চয় বেশী নয় ? হঠাৎ অবেলায় কি মনে করে ?'

'সব সময় কি বেলা থাকতে আসা যায় ?' ভাদুড়ী বালিশ সরিয়ে বিছানার এক পাশে বসে পড়লেন।

'এদিকে এসেছিলেন বুঝি ?'

বাণীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভাদুড়ী হাত বাড়িয়ে বাণীর একটা হাত চেপে ধরলেন।

ঘাড় ফিরিয়ে বাণী এদিক ওদিক দেখে নিলো। নার্সের আসার সময় হয়নি। চাকরবাকর চট করে ঢুকবে না এ ঘরে। বাবাও ঢোকবার আগে কাশির টুকরো পাঠাবেন। সে সব ভয় নেই। কিন্তু নাই বা দেখলো বাইরের লোক, নিজের মনও তো কম কৌতূহলী নয়।

'তোমাকে সকাল থেকে বড়ো মনে পড়লো, তাই চলে এলাম।' ভাদুড়ী আস্তে আস্তে বললেন কথাগুলো। থেমে থেমে।

দু-একবার চেষ্টা করেও বাণী পারলো না। কথা বলতে গেলেই কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়! বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠা পুঞ্জীভূত কথার স্তূপ ঠোঁটের ওপারে ভেঙে ভেঙে পড়ে। ঠোঁটের শুধু কাঁপনই সার, একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারে না।

ভাদুড়ী হাত ছেড়ে পা ধরলেন। টিপে টিপে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর হেসে বললেন, 'কাল অপারেশন করাতে

আপত্তি নেই তো, নাকি ভয় করবে ?'

বাণীর দু'চোখে বিদ্যুতের ঝলক, 'ভয় আমার আর কিছুতেই করবে না।'

তাই নাকি' ভাদুড়ী বাণীর গালে আলতো টোকা দিলেন, 'হঠাৎ এমন অভয়মন্ত্র পেলে কার কাছে ?'

বাণী একটু এগিয়ে ভাদুড়ীর বুকের ওপর মাথাটা রাখলো।

নিচের এদিকের ঘরটাই ঠিক হলো। ভাদুড়ীই সব বন্দোবস্ত করলেন। অপারেশন-টেবিল থেকে এ্যানাসথেটিক-এক্সপার্ট। ভোর ভোর কাজ শুরু করাই ভালো।

ঘরে ঢুকেই ভাদুড়ী থমকে দাঁড়ালেন। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বাণী উপুড় হয়ে রয়েছে বিছানায়। কোন সাড়াশব্দ নেই। এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন, 'বাণী।'

বাণী উঠে বসলো। চোখের জল শুকিয়েছে, কিন্তু দাগ নয়। ভাদুড়ী একটা হাত বাড়িয়ে দিতেই হাতটা বাণী আঁকড়ে ধরলো।

'কোন ভয় নেই, সারিয়ে তোমাকে তুলবোই। আমি কথা দিচ্ছি।'

এবারও কোন উত্তর দিলো না বাণী। কেবল মুখ তুলে চাইলো।

পর্দার ওপারে জুতোর শব্দ। বাপের গলা। বাণী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ভাদুড়ীর হাত ছাড়লো না।

বাপ এগিয়ে এসে বাণীর পিঠে হাত রাখলেন, 'কোন ভয় নেই মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সব ঠিক হয়ে যাবে! জীবন্মৃত হয়ে বাঁচার শেষ। প্রেমাস্পদকে নিয়ে নতুন জীবনযাত্রা। সামনের অন্ধকার দিনগুলো পার হতে পারলেই আলোর দেশ। নিকষকাজল জীবনের অবসান।

ক্লোরোফর্ম দেবার সময়ও বাণী একদৃষ্টে চেয়ে রইলো ভাদুড়ীর দিকে। শুধু ডাক্তারই তো নয়, একটা নারীর জীবনের পূর্ণতার প্রতীক, বাঁধার সংকেত। এক দুই থেকে শুরু করে সতেরো পর্যন্ত বাণী গুনলো। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার রাশ, অস্পষ্ট, কেবল গভীর উজ্জ্বল দুটি চোখ, চাপা ওষ্ঠাধর আর তুহিন সাদা এপ্রনের ইশারা। ঠোঁট দুটো অল্প কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেলো।

বিশ্রী ওষুধের গন্ধে বাণীর ঘুম ভেঙে গেলো। একটা যন্ত্রণা। ঠিক কোনখানে আন্দাজ করতে পারলো না। প্রথমে মনে হ'লো হাঁটুর কাছাকাছি, তারপর নিচে, আরো নিচে গোড়ালি বরাবর। অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে উঠতেই নার্স এগিয়ে এলো। কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'কষ্ট হ'চ্ছে?'

কষ্ট! বাণী চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো এদিক ওদিক। মানুষটা কোথায় গেলো? চোখ বন্ধ করার আগে পর্যন্ত যাকে দেখেছে, চোখ খুলে সে মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন।

'ডাক্তার ভাদুড়ী' আস্তে আস্তে বাণী উচ্চারণ ক'রলো।

'তিনি চলে গেছেন। বিকালের দিকে আসবেন বোধ হয়।' নার্স চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললো।

রোদের তেজ দেখে মনে হলো সবে হয়তো দুপুর। বেলা গড়িয়ে এলে তবে আসবেন ডাক্তার। এখনও অনেক—অনেক দেরী। বাণী চোখ বুজলো।

শার্সীর ফাঁক দিয়ে রোদটা গায়ে লাগতেই বাণী জেগে উঠলো। দু হাতে চোখ মুছে নিলো। কোণের দিকে মেঝেয় বিছানা পাতা। ঘুম ভেঙে নার্সও উঠে বসেছে।

আশ্চর্য, একি অফুরন্ত বেলা। দুপুর শেষ হবার নাম নেই। অথচ বিকাল না হ'লে ডাক্তার ভাদুড়ী আসবেন না।

'এখন বিকাল হ'তে অনেক দেরী না?' নার্সের দিকে বাণী মুখ ফেরালো।

'বিকাল হ'তে?' নার্স অল্প হাসলো, 'তা একটু দেরী আছে বই কি। সবে তো সকাল সাড়ে সাতটা!'

সাড়ে সাতটা! সে কি! একটা পুরো রাত কেটে গেছে। কিছু জানতে পারে নি বাণী।

'ডাক্তার ভাদুড়ী'—বাণীর কথা শেষ হতেই নার্স উত্তর দিলো, 'কাল সন্ধ্যার ঝোঁকে ডাক্তার এসেছিলেন। আপনি তখন ঘুমে অচেতন। ডাক্তার অনেকক্ষণ চেয়ার নিয়ে আপনার পাশে বসে ছিলেন।'

বসেছিলেন পাশে? ঠোঁট কামড়ে বাণী চুপ ক'রে শুয়ে

রইলো। পুরনো গানের কলি মনের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

'কাছে এসে ব'সেছিলো তবু জাগিনি।'

মুখ ঘুরিয়ে নার্সকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই বাণী থেমে গেলো। পর্দার নিচে বার্নিশ-চকচকে জুতো। মালিক অচেনা নয়।

চোখ বুজিয়ে ফেললো বাণী। চোখ খুলতেই যাতে ডাক্তার ভাদুড়ীকে দেখতে পায়। পেলোও তাই। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ভাদুড়ী আলতো হাসলেন, 'কেমন আছেন?'

একি, 'তুমি'র অন্তরঙ্গতা থেকে 'আপনি'র উত্তুঙ্গ শিখরে! কিন্তু একটু পরেই খেয়াল হলো, নার্স রয়েছে ঘরের মধ্যে। তার সামনে এ ছাড়া উপায় নেই।

নার্স বেরিয়ে যেতেই বাণী একটা হাত বাড়িয়ে দিলো। স্পর্শ করলো ভাদুড়ীকে। আর ব্যবধান নয়, মিলনের সেতু। এ ছোঁয়া যেন শুধু হাতে হাতেই নয়, মনে মনেও।

ভাদুড়ী সাবধানে বিছানার পাশে বসলেন, 'জানো, কাল কতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাথায় হাত বুলিয়েছি।'

'সত্যি?'

'ঘুমোলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়।'

'আর জেগে থাকলে?'

'সুন্দরতর', ভাদুড়ী তরল হাসলেন।

'তুমি ডাক্তার না হ'য়ে কবি হ'লেই পারতে?'

'সত্যি, তাহলে পা ছুঁয়ে সাধনা করতে হ'তো না। একে-বারেই মনের নাগাল পেতাম।'

'আমি সারবো ?' ব্যাকুল প্রশ্নে বাণীর মুখের পেশী কঠিন হ'য়ে এলো।

'নিশ্চয়, অপারেশন খুব ভালো হ'য়েছে। মাসখানেকের মধ্যে তুমি নিখুঁত হ'য়ে উঠবে।'

বাণীর সারা মুখ আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠলো। কিশলয়ে যেন বসন্তের স্পর্শ।

'বেশি কথা বলো না, ঘুমোবার চেষ্টা করো।' ভাদুড়ী শিয়র থেকে সরে পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। রোগিনী ছেড়ে রোগের সান্নিধ্যে। ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলেন, তারপর খুশী ঝলমল মুখে আবার এসে দাঁড়ালেন মাথার কাছে।

'আপনার সেরে উঠতে মাসখানেকও লাগবে না।' আড় চোখে বাণী দরজার কাছে এসে দাঁড়ানো নার্সের দিকে নজর ফেরালো, তারপর চোখ বন্ধ করলো। ক্লান্তি-শীর্ণ দুটি ঠোঁটে চাপা হাসির আভাস।

বাণী উঠে বসলো সতেরো দিন পর। ওঠা হাঁটা একেবারে বারণ। পিঠে বালিশ দিয়ে দেয়ালে ঠেস। প্রায়-সেরে-ওঠার আনন্দটুকু নিভে যাওয়ার দাখিল। ভাদুড়ীর মুখ গম্ভীর, তার ছায়া কিছুটা প্রফেসর বাপের মুখেও।

বিকালে ভাদুড়ী আসতেই বাণী জিজ্ঞাসা করলো, 'কি ব্যাপার

একটু গম্ভীর ঠেকছে যে ?'

ভাদুড়ী পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেন, 'অবিবাহিতের চাপল্য কি আর শোভা পায়। ঘরণী আসার আগে থেকে সংযত করছি নিজেকে।'

'আহা, খালি কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ! বলো না। পায়ের ব্যাপার সুবিধার নয়, না ?'

'উঁহু, পা ঠিক আছে।'

'তবে ?'

'মানে', ভাদুড়ী আমতা আমতা করলেন, নকল কাশির আওয়াজ, তারপর কি ভেবে ব'লেই ফেললেন কথাটা, 'অপারেশন এখনও তো সম্পূর্ণ হয় নি কিনা। স্কিন-গ্রাফটিং শুরু হবে এবার।'

'আবার ?' আর বেশী কিছু বলতে পারলো না বাণী। নিস্তেজ মুখের ভাব। স্নায়ু শিরাও অবশ।

ভাদুড়ী এগিয়ে এলেন, 'কি নার্ভাস মেয়ে তুমি গো।'

নার্ভাস ! বাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো ভাদুড়ীকে। আপাদমস্তক। তিলে তিলে একটা মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কি মানে ? জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মতন দেহ নিয়েও এ খামখেয়ালী কতদিন চালাবে এরা

ভাদুড়ী মোলায়েম করলেন গলার স্বর। আবেগতরল।

'বাণী, প্রতিমা ঘরে তোলবার আগে তার কোন খুঁত আমি রাখতে চাই না। ভয়ের কিছু নেই, আমায় বিশ্বাস করো।'

আবার সেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন। কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রূপোলী ইশারা। বর্তমান ভোলানো রঙিন ভবিষ্যত। তবে তাই হোক, ভেঙে গড়ে বাণীকে তোমার মতন করে নাও। পাথর কুঁদে কুঁদে ভাস্করের মানসপ্রতিমা গড়ার মতন।

বাণী হাত দিয়ে ভাদুড়ীর একটা হাত চেপে ধরলো। স্পর্শে মাদকতাই নয়, আশ্বাসও পায় বাণী, পরম নির্ভর।

আবার সব কিছুর পুনরাবৃত্তি। ক্লোরোফর্মের গন্ধ, যন্ত্রপাতির আওয়াজ, আশে পাশে মানুষের ফিসফাস শব্দ। নার্স, ভাদুড়ী আর প্রফেসর বাপের অস্পষ্ট কাঠামো। ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব তারপর গভীর সুষুপ্তি।

এবারের যন্ত্রণা আরো বেশী। কোমর পর্যন্ত নড়বার উপায় নেই। জ্ঞান হ'তেই দাঁতে দাঁত চেপে বাণী চীৎকার ক'রে উঠলো। ভাদুড়ী কাছেই ছিলেন। প্রফেসর বাপও। দুজনেই ঝুঁকে পড়লেন দুদিক থেকে। বাণী একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখের দিকে চোখ ফেরালো। বাপের কপালের হিজি-বিজি বলিরেখার মধ্যে সান্ত্বনার ইঙ্গিত নেই, কিন্তু ভাদুড়ীর দুটি চোখ আশ্বাস-উজ্জ্বল। বাণী ক্লান্তিতে নিজের চোখ বন্ধ করলো।

বিছানায় উঠে বসতে আরো দিন চারেক তারপর সব কিছু শুনে অবাক। হাঁটুর মাংস নিয়ে পায়ের পাতায় লাগানো হ'য়েছে। বিধাতার ওপর কারিগরি! এক অঙ্গ ছেদন ক'রে অন্য অঙ্গের পুষ্টি সাধন।

'তুমি সত্যি অদ্ভুত', ভাদুড়ীর কাঁধে মাথা রাখলো বাণী।

বাইরে চাপ চাপ অন্ধকার। ঘরেও তাই। বাতি জ্বালতে গিয়েও কি ভেবে ভাদুড়ী আর উঠলেন না। এই ভালো। উৎকট আলোয় মানুষকে বড় বেশী চেনা চেনা ঠেকে। আলো-ছায়ার রহস্যে ঘেরা সন্ধ্যায় যৌবন যেন আরো দুর্বার, আরো মধুর।

'আরো কদিন গো', খুব নিরুত্তেজ গলা বাণীর।

'দিন পনেরোর বেশী নয়', আধো অন্ধকারে ভাদুড়ীর গলা বেশ গম্ভীর।

বাণীর দুটো হাত নিজের বুকে জড়ো করে রাখলেন ভাদুড়ী। বাণীকে নিজের দিকে নিবিড় ক'রে টেনে নিয়ে বললেন, 'তারপর তোমার সিঁথির মাঝখানে আমার পরমায়ুর নিশানা।'

'যাও', বাণী মুখ লুকালো ভাদুড়ীরই বুকের মাঝখানে।

'তুমি সেরে ওঠো তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীটি! যেদিন তুমি হাঁটতে শুরু করবে সেদিন থেকেই আমি হাঁটাহাঁটি শুরু করবো তোমার বাপের কাছে। এক কথায় মেয়েকে ছেড়ে দেবেন ব'লে তো মনে হ'চ্ছে না।'

'যদি নাই ছাড়ে', কৌতুকে ফেটে পড়লো বাণী।

'তা হ'লে', ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ালেন, 'ক্লোরোফর্ম তো রইলোই হাতের কাছে, রুক্মিণী হরণের চেষ্টা করবো।'

বাইরে পায়ের আওয়াজ হ'তেই দুজনেই থেমে গেলো। ভাদুড়ী দাঁড়ালেন জানলার কাছ ঘেঁষে। বাণী চুপচাপ বিছানায়।

'আপনার পেশেণ্ট কেমন?' হাসতে হাসতে প্রফেসর ঘরে ঢুকলেন।

পেশেন্টের খবর যে তাঁর জানা, হাসিতেই তার হদিশ রয়েছে। কথাটা কিন্তু বাণীর ভারি ভালো লাগলো। আপনার পেশেণ্ট। সত্যিই তো ভাতুড়ীরই পেশেণ্ট। দেহমন তুইই। দেহ সমর্পণ করতে ক্লোরোফর্মের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে মন অর্পণ করেছে প্রথম চোখে দেখার পরম লগ্নে।

'পেশেণ্টকেই জিজ্ঞাসা করুন', ভাতুড়ী হেসে উঠলেন।

খুট ক'রে সুইচ টেপার শব্দ হ'তেই বাণী তু'হাতে চোখ ঢাকলো। শুধু জোর বাতির তেজ ঢাকতেই নয়, তার উপচে পড়া খুশীর খোঁজ যেন না পায় কেউ। আশেপাশের কেউ না। এ শুধু তার নিজস্ব, আর কিছুটা বুঝি জানালার পাশে দাঁড়ানো লোকটার।

আর দিন তুয়েক। তারপরই বাণী উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে। পায়ের পাতা চেপে। এ ঘর থেকে ও ঘর। আগের মত হাঁসের মতন হেলে তুলে চলা নয়, ময়ূরীর মতন পেখম মেলে। কথাটা অবশ্য ভাতুড়ীর।

বিছানাটা টেনে জানলার কাছ বরাবর আনা হ'য়েছে। এখান থেকে ফটক পর্যন্ত দেখা যায়। পিচঢালা পথের কিছুটাও। ভাতুড়ী ফটক পার হবার আগেই নজরে পড়বে।

আশ্চর্য লাগে বাণীর। কতদিনের বা আলাপ, অথচ এমন করে নিজের ক'রে নিলো কি ক'রে। স্কুলকলেজ-জীবনেও তু-তিনজন ছেলের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিলো। বই

বগলে বাবার ছাত্রও কয়েকজন। কিন্তু আলাপের বহর ঠোঁটের সীমানা পর্যন্ত। বুকে কেউ দাগ কাটতে পারে নি। ভাদুড়ীর ব্যাপার অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেলো।

মাঝে মাঝে কয়েকজন সহপাঠিনী দেখতে এসেছে বাণীকে। দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও। বাণী কারুর কাছে বলে নি কিছু। এখন কোন কথা নয়। আচমকা বিয়ের চিঠি পাঠিয়ে চমকে দেবে সবাইকে। সব চেয়ে অবাক হবে সুনীতি সেনজায়া। ব্যাপার শুনে চেঁচামেচি করবে, 'ওসব শুনছি না, ঘটকালি বিদায় আমার প্রাপ্য।'

শব্দ হতেই বাণী মুখ ফেরালো। নার্স এসে দাঁড়িয়েছে মালিশের শিশি হাতে। এক ঘণ্টা ধ'রে চলবে মালিশ। ভুরু কুঁচকে বাণী পা দুটো এগিয়ে দিলো।

মালিশ শেষ। ক্লাস খতম ক'রে ওপরে ওঠবার মুখে বাপ একবার উঁকি দিয়ে গেলেন। পর্দা সরিয়ে হাসলেন একটু, 'আর কি, আর দুদিন পরেই তো আমার বাণীমা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সারা ঘরময়।'

বাণী খাবার প্লেট থেকে মুখ তুললো, 'সত্যি, এবার সেরে উঠে কেবল ছুটে ছুটে বেড়াবো। কতদিন ধরে পড়ে আছি।' কাবুলী বিড়ালের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে বসলো বাণী। মনে মনে ভাবলো, হুঁ, ছুটাছুটি তো করতেই হবে। নতুন ঘর-গেরস্থালী আরম্ভ করার মেহনত কম নাকি। নিজের সংসার নিজের মনের

মতন করে সাজাতে হবে না। কল্পনায় দেখলো ভাদুড়ীর প্রশংসা-চকচক চোখের দৃষ্টি। গৃহিণীপনার কৃতিত্বে নিজেই হেসে উঠলো।

দেয়ালঘড়ির দিকে নজর পড়তেই বাণী থেমে গেলো। আটটা দশ। আশ্চর্য, মানুষটার আসবার নাম নেই এখনও। অন্যদিন ছটার মধ্যেই হাজিরা দেয়, থাকে রাত নটা পর্যন্ত। আজ বলে গেছে কথা পাড়বে বাণীর বাপের কাছে, সেইজন্যই বুঝি দেরী করছে আসতে। মনে মনে কথা সাজিয়ে নিয়ে তবে এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবে।

শয়তানের কথা চিন্তা করলেই সে নাকি এসে দাঁড়ায়, দেবতাও বুঝি তাই। পর্দা সরিয়ে ভাদুড়ী ঘরের মধ্যে ঢুকলো। আজ আর সার্ট প্যান্টের আঁট বাঁধন নয়, পায়ে ডার্বি জুতো আর হাঁটু ছুঁই ছুঁই মোজার বাহার নেই। গরদের পাঞ্জাবী আর ফরাসডাঙ্গা এগারো হাতি, কাকের চোখকে লজ্জা দেওয়া কুচ্‌কুচে পাম্পস্থ। ছাদনাতলায় যাবার পোষাক। কিন্তু লগ্ন না আসতেই নটবর বেশ যে! নাকি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের মহলা!

বিছানার পাশে নয়, চেয়ার টেনে ভাদুড়ী একটু দূরে বসলেন। অবশ্য এমন কিছু দূরে নয়। হাত বাড়ালে বাণীকে বেশ ছোঁয়া যায়।

'কেমন আছো', চেয়ার সুদ্ধ ভাদুড়ী বাণীর দিকে কাত হলেন।

এ কথার উত্তর দিলো না বাণী। ভুরু দুটো তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো ভাদুড়ীর দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বললো,

'বাবার কাছে যাবে না ?'

'যাবো। ফেরবার মুখে তোমার বাবার কাছে হয়ে যাবো। রোজই একবার তোমার খবর দিয়ে যেতে হয়।'

ওঃ শুধু বাণীর খবর দেবার জন্য বাপের কাছে যাওয়া দরকার, কতটুকু উন্নতি করেছে বাণী, সেই খবরটুকু! আর কিছু বলবার নেই, ভাদুড়ীর নিজের কোন কথা? ভাদুড়ী আর বাণী দুজনের ?

অভিমানে ঠোঁট ফোলাবার আগেই বাণী থেমে গেলো। ভাদুড়ী উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন পায়ের কাছে। হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখলেন পাতা দুটো। স্কিন্‌গ্রাফটিংয়ের অভূতপূর্ব সাফল্যে বোধ হয় উল্লসিত হলেন। তারপর চেয়ারে ফিরে এসে হেসে বললেন, 'আর ঠিক দুদিন। শনি, রবি। সোমবার থেকে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো সারা ঘরময়। এ দুদিন কিন্তু খুব সাবধান। এখনও চামড়া খুব নরম। চলাফেরা করার চেষ্টা করলেই সর্বনাশ।'

অস্থিবিদের ফাঁকে ফাঁকে আসল মানুষটার খোঁজে বাণী এধার ওধার নজর চালালো। আশ্চর্য, আজ আর বুঝি হালকা কোন কথা বলবেনই না এই প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন ভাদুড়ী। বাণী তাঁর পেশেন্ট, আর কেউ নয়।

'তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো ?' বাণী বালিশে ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

'কেন, কি হয়েছে ?' ভাদুড়ী খাঁজ ফেললেন দুটি ভুরুর

মাঝখানে।

'আজ কি কথা ছিলো মনে আছে ?'

'আছে বৈকি। সব কথাই আজ বলবো।' ভাদুড়ীর স্বরে গাম্ভীর্যের মিশেল।

কপট বিরক্তিতে বাণী ঠোঁট ওল্টালো, 'বলো বাপু কি তোমার কথা। এই হাত জোড় ক'রে বসলাম। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।'

কিন্তু হাতজোড় ক'রে বেশীক্ষণ বাণী বসতে পারলো না। ভাদুরীর মুখের ভাঁজে, চোখের তারায়, অমঙ্গলের ইশারা। দৃঢ়-সংবদ্ধ ঠোঁটে কঠিন প্রতিজ্ঞার আভাস।

'লুকোচুরি নয়, কথাটা স্পষ্ট ক'রেই তোমাকে জানানো দরকার।' চেয়ার টেনে ভাদুড়ী আরো এগিয়ে এলেন। বাণীর আরো কাছে।

দু' এক মিনিট। কুয়াশার অস্পষ্টতা কেটে যাবার মতন একটু একটু করে সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ হ'য়ে এলো। এই রকমই কিছু একটা বাণী আন্দাজ করছিলো। আবছা অন্ধকারে তিলে তিলে ছড়িয়ে পড়া একটা ভয়ের মতন, চাঁদের আলো ঢেকে ফেলা অতিকায় বাদুড়ের ডানার মতন, একটা অস্বস্তি শরীর আর মন দুই-ই ছেয়ে ফেলেছিলো। এরকম কিছু যে হবে এ যেন ওর জানা।

নিজের ব্যাণ্ডেজকরা পা দুটোর দিকে একবার দেখে নিলো, বাণী তারপর ভাঙ্গা গলায় বললো, 'এ তোমাকে বলতে হবে না,

এ আমি জানতাম। অপারেশন করার আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি।'

'কি ?' ভাদুড়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাণীর আপাদ মস্তক দেখলেন, 'কি তুমি বুঝতে পেরেছিলে ?'

'আমার পা সারবে না। এ পঙ্গুতা আমার যাবার নয়।' বাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো চাপা গলায়।

'পা তোমার সেরে যাবে। কোন খুঁত থাকবে না।' প্রত্যেকটি কথা ভাদুড়ী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন। আরোগ্য-বাণী নয়, ফাঁসির হুকুম শোনাচ্ছেন, এমনি ভঙ্গীতে।

সেরে যাবে ? তবে ? বাণী মুখ তুললো। জলটলমল আয়ত দুটি চোখ।

ভাদুড়ী চোখ ফেরালেন অন্ধকার বাইরের দিকে। সেই দিকে চেয়েই বললেন, 'আপনার কাছে আমি মাপ চাইতে এসেছি।'

'মাপ ?'

'হ্যাঁ, এ কদিনের অভিনয়ের জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন এ ছাড়া আমার আর উপায় ছিলো না।'

সিনেমার ছবির মত অল্প অল্প কাঁপতে শুরু করলো ডিসটেম্পার করা আকাশনীল দেয়াল, রঙ চঙে বাতির সেড্, এমন কি এত কাছে বসা ভাদুড়ীর ঋজু সুঠাম দেহটাও। খুব আস্তে দুলছে। মৃদু ভূকম্পনের তালে তালে। দুটো হাতে দেয়াল ধরে বাণী টাল সামলালো।

কিন্তু কিসের অভিনয়! কিসের উপায় ছিলো না!

ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন মুখের রেখা। দুটো হাত আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর। অভিনয় শেষে এমন একটা করতেই যেন নাটকীয়ভাবে দাঁড়িয়ে উঠলেন। পর্দা পর্যন্ত মেঝে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন বাণীর মুখোমুখি।

'সত্যি, এ ছাড়া আর উপায় ছিলো না। আপনাকে যেরকম নার্ভাস দেখলাম অপারেশনের আগে, সাহস হলো না। হার্ট দুর্বল, এমন একটা অপারেশনের কষ্ট কিছুতেই আপনি সহ্য করতে পারতেন না। হিতে বিপরীত হতো। আপনার কল্পনা-প্রবণ মন। ঝাঁঝালো ওষুধের বদলে তাই এ অভিনয় শুরু করতে বাধ্য হলাম। মনের মাধ্যমে দেহের চিকিৎসা, ও দেশে এর রেওয়াজ খুব বেশী।'

ভাদুড়ী একটু থামলেন। পকেট থেকে বর্ডার দেওয়া রুমাল বের করে কপালে বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা ঘাম মুছলেন সন্তর্পণে। আবার দাঁড়ালেন জানালার কাছ বরাবর।

দু হাতের মুঠোতে বাণী শক্ত ক'রে খাটের বাজু চেপে ধরলো। সামনে পাঁশুটে ধোঁয়ার স্রোত। ক্লোরোফর্ম করার আগের অবস্থা

'এ অভিনয় করতে আমার বুক ফেটে গেছে। বারবার নিজেকে আমি অভিশাপ দিয়েছি। প্রতি মুহূর্তে সুমিত্রার কথা মনে পড়েছে, কিন্তু উপায় ছিলো না।' একটু থামলেন

ভাদুড়ী। কথার মাঝখানে দম দিলেন। তারপর শুরু করলেন আরো দ্রুতলয়ে, 'সত্যি উপায় ছিলো না। আমার যশ, প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যত সব নির্ভর করছিলো আপনার আরোগ্যলাভের ওপর। আপনি আমার প্রথম রোগী, আমার প্রথম এক্সপেরিমেণ্ট।'

'নিজের ভবিষ্যতেব জন্য আমার ভবিষ্যত এমনি করে'—কথা শেষ করতে পারলো না বাণী। শাড়ীতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। খুব জোরে অবশ্য নয়। আওয়াজ কানে গেলে প্রফেসর ক্ষিপ্র পায়ে নেমে আসবেন সিঁড়ি দিয়ে। মুখোমুখি দাঁড়াবেন। তারপর! কি করবে বাণী? জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনী শোনাবে বাপকে? অভিনয়ের পঞ্চমাঙ্কের ইতিহাস বলবে ফেনিয়ে ফেনিয়ে?

চাপা হাসিতে ঘর ভরে গেলো। ভাদুড়ী হাসছেন। মৃদু অথচ সুরেলা। এ হাসি আয়ত্ত কবতে হয়তো অনেক সময় লেগেছিলো। 'বিনিময় প্রথার ওপর সারা দুনিয়া চলেছে সে কথা নিশ্চয় আপনার অজানা নয়। প্রস্তর যুগ থেকে প্লাস্টিক যুগ পর্যন্ত একই নীতি। অর্থের বদলে ইজ্জৎ, ইজ্জতের বদলে অর্থ এ যুগেরও রেওয়াজ। আমি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি, কিছু পরিমাণে যশও। ইতিমধ্যেই দু একটা ডাক্তারী কাগজে আপনার কেসটা ছাপা হয়েছে। আপনার বাবার স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্রও পেয়েছি, আশা করছি পসার জমাতে খুব অসুবিধা হবে না। কিন্তু তার বদলে আপনিও কম পান নি। পঙ্গুতা থেকে পূর্ণতা পেয়েছেন, অচল পয়সা বলে যে সমাজ সরিয়ে

রাখতো আপনাকে, সেই সমাজই আপনাকে পুরোভাগে বসাবে। লাভ আপনারও কম হয় নি। আমায় মাপ করবেন, যেটুকু করেছি বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে, আপনার মুখ চেয়ে।'

ভারী পর্দাটা তুলে উঠলো। জুতোর শব্দ প্রথমে কঠিন মোজেইক মেঝেতে, তারপর মখমল নরম ঘাসের ওপর। লোহার গেট বন্ধ করার যান্ত্রিক শব্দ।

সব থেমে যেতে বাণীর খেয়াল হলো। মানুষটা নেই, আর কোনদিনই হয়তো থাকবে না। স্কিনগ্রাফটিং। দেহের এক অংশ ছেদন করে অন্য অঙ্গের পুষ্টিসাধন। ঠিক তাই, মনকে পঙ্গু করে পায়ের পাতার শ্রীবৃদ্ধি। কোন ক্ষতিই তো হয় নি বাণীর। একজনের প্রাণের বদলে আরেক জনের প্রতিষ্ঠা।

হঠাৎ বাণীর নজরে পড়লো সামনের সেলফে সাজানো সারি সারি মালিশের ওষুধ। 'বিষ' কথাটা রক্তের অক্ষরে খুব বড়ো করে লেখা। এ ছাড়া আর উপায় কি? সারাজীবন এ অপমানের বিষ মেখে নীলকণ্ঠ হওয়ার চেয়ে এতো ঢের ভালো।

কিন্তু নামতে গিয়েই বাণীর মনে পড়ে গেলো। দু-তিন দিন চলাফেরা একেবারে বারণ। নরম মাংস পায়ের পাতার। শিরা ছিঁড়ে বিপত্তি ঘটাও আশ্চর্য নয়। মালিশের শিশি থেকে চোখ ফিরিয়ে বাণী নিজের পায়ের দিকে চাইলো। নরম তুলতুলে গোলাপী মাংস। আর শরীরের বুঝি কোথাও কোন অপূর্ণতা নেই বাণীর। নিটোল নিখুঁত।

ইতিহাস

সামনে আরো সতেরো জন। সকাল দশটা থেকে শুরু হ'য়েছে, আর এখন বেলা একটা বাজতে চললো, এর মধ্যে বড়ো জোর জনাবশেক লোক ঢুকেছিলো ভিতরে। কি এত কথা কে জানে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু বুঝি খোঁজ করতে চায়। কোথায় বাড়ি, কবে ছটকে এসেছে এপারে, গাঁটের পয়সা খরচ করে রেলে চড়ে এসেছে, না সরকারের পাঠানো স্টিমারেই পেয়েছিল জায়গা। এমনি সব হাজার প্রশ্ন। এতেই হয়তো শেষ নয়। আরো জানতে চায়। বাস্তুভিটের আয়তন আর জমি-জমার হিসেব। সঙ্গে পরচা আছে নাকি, কিংবা কোন দলিল-দস্তাবেজ, নিদেনপক্ষে থানার অফিসারের কোন চিরকুট।

ভাবতেই দেবনাথবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এত খুঁটিয়ে তবে জানতে হবে আসল কথাটা! কেন কপালের নীচে ড্যাবডেবে দুটো চোখ নেই বুঝি কর্তাদের। একবার চোখ মেলে চাইলেই তো বেশ বোঝা যায়। পোষাকে পরিচ্ছদে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, সবচেয়ে বড় কথা হতাশামাখা চোখের দৃষ্টি আর ঠেলে-ওঠা চোয়ালের শুকনো হাড়দুটোর ওপর নজর বোলালেই তো পিছনের ভেঙ্গেচুরে-যাওয়া জীবনটার কথা জানতে বাকি থাকে না। বাস্তুহারা তো নয়, স্রোতের শ্যাওলা। শিয়ালদর ত্রিপল ঢাকা তাঁবুর তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে ঢুকলেন

পুনামচাঁদ নাহাটার ধর্মশালায়। সেখান থেকে সাতদিনের মেয়াদ ফুরোতেই, বহু কষ্টে কাশীপুরের খালের ধারে নড়বড়ে টিনের চালার নিচে আশ্রয় মিললো, তাও মালিকের বহু হাতে পায়ে ধ'রে। এখন শুধু একটা হুমকির ওয়াস্তা। তারপর আবার কোন্ ঘাটে গিয়ে ঠেকতে হবে, কে জানে।

দেবনাথবাবু নিচু হয়ে কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ওপর জমে ওঠা ঘামের বিন্দুগুলো মুছে নিলেন। ডান পাটা বেশ টাটিয়ে উঠেছে। এই বয়সে সমানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ধন্না দেওয়া সোজা কথা! বয়সের ছেলে থাকলে কি আর ওঁকে এসব হাঙ্গাম-হুজুগ পোয়াতে হতো। তিন তিনটি মেয়ে। তিন জামাই ছড়িয়ে আছে তিন জায়গায়। সবচেয়ে যে কাছে, সেও কানপুর। কালেভদ্রে পোস্টকার্ডে খোঁজ খবর নিতো আগে, মাস পাঁচ ছয় তাও বন্ধ হয়ে গেছে। তা হোক। তাতে কিছুমাত্র আক্ষেপ নেই দেবনাথবাবুর। মেয়েদের ভালো জায়গায় দেখে শুনে বিয়ে থা দিয়েছেন, আর কি। তাঁর কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। মেয়েরা দেখাশোনা করুক না করুক, খোঁজখবর নিক না নিক, সেটা মেয়েদের ধর্ম।

হাত দিয়ে জানালার কবাটটা ধরে দেবনাথবাবু শরীরটা ভর দিলেন। কাঁহাতক দাঁড়িয়ে থাকা যায় এমনিভাবে। এর আগে একদিন বহু কষ্টে ঠেলেঠুলে ফর্ম জোগাড় করেছিলেন, সে প্রায় গলদঘর্ম হ'য়ে। ফর্ম জমাও দেওয়া হয়ে গেছে। আজ ডেকে পাঠানো হয়েছে আরো খোঁজ খবর নেবার জন্য। যদি

কর্তারা সন্তুষ্ট হন তদ্বির তদারক করে তবে দু' কাঠা করে জমি মিলবে আর মিলবে মাটির দেয়াল আর আটটা বাঁশের খুঁটির ওপরে টিনের চাল দেওয়া মাথা গোঁজবার আস্তানা। তাই বা কম কি। এ বয়সে চাকরী বাকরী করা তো আর পোষাবে না, তাছাড়া কেই বা দিতে যাবে চাকরী। কোন রকমে লুকিয়ে চুরিয়ে কোমরে বাঁধা গেঁজেতে আনা সামান্য পুঁজি ভাঙ্গিয়েই খেতে হবে। বাড়তি জমিতে শাকসব্জি, লাউ কুমড়ো লাগিয়ে রোজকার তরিতরকারীর সমস্যাটাও যদি মেটে। দেবনাথবাবুর চোখদুটো সত্যিই জলে ভরে এলো। একেই বলে ভগবানের মার। একশ বিঘে ধান জমি, চারটে বড়ো বড়ো ঝিল তার ওপর তাল সুপুরীর বন। বছরে শুধু সুপুরীই তিনি বেচতেন কম টাকার। কোঠা দু'তলা বাড়ি। সেগুন কাঠের দরজা জানলা। সারা গাঁয়ে এক নন্দীবাবুদের ছাড়া ওরকম বাড়ি ও-তল্লাটে ছিল না। কোথা থেকে যে কি হয়ে গেলো।

আবার কুঁজো হলেন দেবনাথবাবু। কপালের ঘাম নয়, এবারে কোঁচার খুঁট দিয়ে দুটো চোখ সজোরে রগড়ালেন। এই বয়সে কপালে এমন দুঃখও ছিলো।

কয়েক পা এগোতে হলো। আর জন চোদ্দ। খুব বেশী দেরী হয়তো আর হবে না।

ওপারে থাকতে মনে হয়েছিলো প্রাণ আর ধর্মটা নিয়ে এদিকে ছিটকে আসতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু এদিকে চলে এসে কেবলই মনে হচ্ছে জমিজেরাতের কথা। চোখের ওপর

ভাসছে ফলন্ত তাল আর সুপুরীগাছের সার, নিটোল পরিপুষ্ট ধানের গোছায় ভরা আলের ওপর নুয়ে পড়া গাছগুলো। কালো কুচকুচে দামাল তিন তিনটে গাই। ঝকঝকে গোবর নিকানো উঠোন, কাকের চোখের মতন স্বচ্ছ ঝিলের জল।

মনে পড়বে নাই বা কেন। এসব তো আর পড়ে পাওয়া সম্পত্তি নয়, যে ফেলে এসেছেন বলে পিছটান থাকবে না কোন। দস্তুরমত নিজের রক্ত আর ঘাম দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা প্রতি ইঞ্চি জায়গা। নইলে টুলো পণ্ডিত রমানাথ ভট্চাযের ছেলেকে কে চিনতো আগে। বাপের বৃত্তি ধরলে এ দুর্দিনে অনেক আগেই জমি নিতে হ'তো। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হতো না পাঁচজনের সামনে। কিন্তু দেবনাথবাবু যথেষ্ট হুঁশিয়ার। পুঁথিপত্তর চালের বাতায় গুঁজে রেখে পরিবারের গায়ের গয়না বেচে সুদীকারবার শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম লজ্জাসরমে গাঁয়ের লোক তাঁর কাছে ভিড়তো না, কিন্তু অভাবের কাছে আবার লজ্জাসরম। সদর দরজা দিয়ে যারা লজ্জায় ঢুকতো না, তারাই খিড়কী দরজা দিয়ে বউকে পাঠাতো দেবনাথবাবুর স্ত্রীর কাছে। টাকায় টাকা লাভ, তার ওপর দুঃস্থ গরীব বিধবা হলে তো আর কথাই নেই। আজীবন শুধু সুদের কড়িই গুণে গেলো এমন লোকের কমতি ছিলো না। দেবনাথবাবু বছর দুয়েকের মধ্যেই আসর জমিয়ে ফেললেন। ছোট কাঁঠাল কাঠের হাত বাক্সটা নিমেষের জন্যও কাছছাড়া করতেন না। দেয়ালে টাঙানো দেবদেবীর পটে প্রণাম করার সঙ্গে

কাঁঠাল কাঠের হাতবাক্সটার ওপরও ভক্তিভরে মাথা ঠেকাতেন। শেষদিকে অবশ্য ছোট হাতবাক্সে আর কুলোয় নি, বড় সিন্দুকে জিনিষ চালান দিতে হয়েছিলো। সিন্দুক ভরার সঙ্গে সঙ্গে জমিজায়গা, সম্মান প্রতিপত্তি সব কিছুই ভরে উঠেছিল। সারা গাঁয়ের লোক উঠতো বসতো দেবনাথবাবুর কথায়। তাঁর বাড়ির কাজে কর্মে না বলতে এসে বেগার খেটে দিয়ে যেতো। পঞ্চায়েতের বড় মাতব্বর, তাঁকে অখুসী রাখবে এমন বুকের পাটা আশেপাশে তিনখানা গাঁয়ের মধ্যে কোন লোকের ছিল না।

জানালা দিয়ে রাস্তার চলমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে দেবনাথবাবু পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে করতে লাগলেন। একটা হাঁক দিলে সারা গাঁয়ের লোক এসে হাজির হতো যাঁর উঠোনে, কল্পনাই করা যায় না সেই লোক হাজারজনের সঙ্গে মিশে অন্যের দরজায় করুণার প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এক টুকরো জমি, গ্রীষ্ম আর বর্ষা থেকে বাঁচবার জন্য সামান্য একটা আচ্ছাদন।

সামনে আর মাত্র চারজন। আড় চোখে দেবনাথবাবু একবার ঘড়ির দিকে চাইলেন। তিনটে কুড়ি। আশা করা যায় যে, চারটের মধ্যেই হয় তো তাঁর ডাক পড়বে। ইচ্ছা ছিলো কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবেন। একবার পাঁচটা বাজলেই ট্রামে বাসে ওঠবার কারুর সাধ্য নেই। ঘরমুখো জনতা যেন মরীয়া হ'য়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে দেবনাথবাবু আরো এগিয়ে এলেন। পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা হাতের মুঠোয় করে নিলেন। পরচা অবশ্য তিনি সঙ্গে করে আনতে পারেন নি, কিন্তু সমস্ত তাঁর নখ-দর্পণে। উত্তরে গোঁসাইবাবুদের বেড়া, পূবে ইস্কুল বাড়ির মাঠ আর অন্য দুটো দিকে নিজের প্রকাণ্ড ঝিল দুটোই তো সীমানা। এ কি ভুল হবার। জমির টুকরো বন্ধক রেখে টাকা নিতো মানুষে, অভাবের তাড়নায় ধানজমি পর্যন্ত তুলে দিতো মহাজনের হাতে, তারপর বছর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে দেবনাথবাবুর বেড়া এগিয়ে যেতো। দলিল বদল হতো হাতচিটের সঙ্গে। লাল খেরো বাঁধানো খাতাটা খুলে দেবনাথবাবু লিখতেন 'শ্রীশ্রীদুর্গা', তার-পর তারিখ দিতেন, খাতকের নাম লিখতেন, পাশে তার জমির খুঁটিনাটি। লোকেরা আড়ালে আবডালে বলতো, 'রাক্কুসে পদ্মাও বাঁড়ুজ্যে মশায়ের চেয়ে ভালো, সে এক পার ভাঙ্গে বটে, তবু সঙ্গে সঙ্গে আর এক পার ছেড়েও দেয়, কিন্তু এ একেবারে—'

কথাগুলো দেবনাথবাবুর কানে যে একেবারে আসতোও না এমন নয়। তিনি নিমীলিত চোখে দুটো হাত জোড় করে পটের দিকে ফিরে বলতেন, 'মানুষ অজ্ঞান। না জেনে, না শুনে কত কিছুই বলে মা, তাকে ক্ষমা কর। তারা, তারা।' তারপর খড়ম পায়ে দিয়ে উঠোনে ধান মাড়াইয়ের তদারক করতে নামতেন। নিটোল সোনার বরণ ধান। রোদ পড়ে ঝকঝকে করে জ্বলতো। সরু সরু দানা শ্বেত পাথরের টুকরোর মতন। আর কি খোসবো। বাতাস পর্যন্ত ভুর ভুর ক'রে উঠতো। উঠোনে দাঁড়িয়ে

দেবনাথবাবু টেনে টেনে সেই নিঃশ্বাস নিতেন। গন্ধেই প্রাণ মাত করে দিতো।

চাপরাশির গলার আওয়াজে দেবনাথবাবুর খেয়াল হলো। এবার তাঁর পালা। কোচার খুঁট দিয়ে আবার মুখটা মুছে নিয়ে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরে তিনি ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

সারি সারি টেবিল পাতা। কাগজপত্রের স্তূপ। এগিয়ে গিয়ে সামনে রাখা চেয়ারের ওপর বসতেই ভদ্রলোকটি মুখ তুললেন, 'নাম ?' দেবনাথবাবু নামটা বললেন। পাশে রাখা কাগজপত্রের মধ্য থেকে একটা কার্ড টেনে বের করলেন ভদ্রলোক। আল-গোছে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই এখানে ? কলকাতায় কিম্বা আশেপাশে কোথাও ?'

দেবনাথবাবু ঘাড় নাড়লেন। আত্মীয়স্বজন থাকলে আর এই প্রৌঢ় বয়সে এই টানাহেঁচড়া করতে হয় নিজেকে। লোক-বল, ধনবল সবই ছিলো এক সময়ে, কিন্তু সেসব পিছনে ফেলে চলে আসতে হয়েছে। এ-বয়সে এমন ঝাপ্‌টা আসবে, কে ভাবতে পেরেছিলো।

দেবনাথবাবু ভদ্রলোকটির সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলেন।

'মশাইয়ের কি করা হতো,' সামনের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারবার-টারবার ছিলো কিছু ?'

কিসের কারবার ছিলো বলতে গিয়েই দেবনাথবাবু কি ভেবে থেমে গেলেন। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে বললেন, 'কারবার আর কি। কিছু ধান-জমি ছিলো; সুপুরী, ডাল, পুকুরের মাছ এই সবেতেই চলে যেতো কোন রকমে।

দেবনাথবাবু খুবই আশা করেছিলেন যে, এই উত্তর দেবার পর ভদ্রলোক নিশ্চয় একবার মুখে তুলে চাইবেন।

কিন্তু ভদ্রলোক টেবিলের ওপর থেকে লাল পেন্সিল বের করে খস খস করে কি লিখলেন কার্ডটার ওপরে, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'সি সেকশন।'

'সি সেকশন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বাঁ হাতি প্রথম ঘর। সামনের বুধবার এসে দেখা করবেন।'

দেবনাথবাবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন, 'স্যার অনেকদিন ধরে হাঁটাহাটি করছি, যদি দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি—'

টেবিলের ওপর রাখা কলিং বেলটা টিপলেন ভদ্রলোক। চাপরাশী পাশে এসে দাঁড়াতেই বললেন, 'দুসরা বাবুকো।'

লাঠিতে ভর দিয়ে দেবনাথবাবু উঠে পড়লেন।

ভিড় অনেকটা কম। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পরই দেবনাথবাবুর ডাক পড়লো।

হৃষ্টপুষ্ট একটি ভদ্রলোক। নিখুঁত সায়েবী পোষাক। পাশে

একটি মেয়ে মাথা নীচু করে একমনে টাইপ করে চলেছে।

দেবনাথবাবু বসতেই ভদ্রলোক মুখ তুলে এক গাল হাসলেন, 'বুঝি, বড্ড কষ্ট দেওয়া হয় আপনাদের, বারবার ঘোরাঘুরি করতে হয়। কিন্তু দেখছেন তো ব্যাপার। হু-হু ক'রে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। দিনরাত খেটেও আমরা কূল পাচ্ছি না।'

ভারি অমায়িক লোকটি। দেবনাথবাবু সমর্থনসূচক মিষ্টি হাসলেন।

'নামটা বলুন দয়া করে।'

'শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'জেলা?'

'বরিশাল।'

'গ্রামের নাম?'

'পানপুকুর।'

সঙ্গে সঙ্গেই টাইপের আওয়াজ থেমে গেলো। মেয়েটি ঘাড় কাত ক'রে ভদ্রলোকটির দিকে ফিরে বললো, 'গ্রামের নাম পানপুকুর?'

'হ্যাঁ, পানপুকুর। ও ভালো কথা মিস রয় আপনার বাড়ীও তো পানপুকুর। আমার মনেই ছিল না। দেখুন তো চিনতে পারেন নাকি ভদ্রলোককে? নাম হচ্ছে শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

মেয়েটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলো। ভুরু দুটো কোঁচকালো। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির আভাস। তারপর মাথা নীচু ক'রে বললো, 'আমি তো বহুদিন গ্রাম ছাড়া। গাঁয়ের লোকের কথা

মনেও নেই বিশেষ।'

মেয়েটি চোখ নামাবার পরেও কিন্তু দেবনাথবাবু চোখ নামতে পারলেন না। খুব যেন চেনা চেনা লাগছে মেয়েটির মুখ, বিশেষ ক'রে আয়ত দুটি চোখের ঢলঢলে চাউনি। আজ অবশ্য শহরের উগ্র প্রসাধনের তলায় গাঁয়ের মেয়ের রূপ হয়তো সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে, কিন্তু একবারও যেন কোথায় দেখা হ'য়েছিলো মেয়েটির সঙ্গে, হয়তো আজকের মতন এমনি মুখোমুখি।

দেবনাথবাবু জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলেন না, 'পানপুকুরে আমার বহুকালের বাস। প্রায় তিন পুরুষের। আপনাদের কোন্ বাড়ীটা বলুন তো ?'

মেয়েটি আর একবার মুখ তুললো, 'ইস্কুল-বাড়ীর গায়েই আমাদের বাড়ী ছিলো।'

'ইস্কুল-বাড়ীর গায়ে,' দেবনাথবাবু আমতা আমতা করলেন, 'পশ্চিমে তো হ'লো গিয়ে গোকুল রায়ের বাড়ী।'

'গোকুল রায় আমার বাবা'—মেয়েটি দ্রুততালে টাইপ করতে শুরু করলো। মেশিনের খটাখট্ শব্দে দেবনাথবাবুর কানে কথাগুলো পৌঁছোতেও দেরী হ'লো বেশ। কিন্তু পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সারা মুখ ছাইয়ের মতন ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো। একটি বিন্দু রক্ত নেই কোথাও। জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলে যেমন হয়, অবিকল সেইরকম।

গোকুল রায়ের মেয়ে, তাই বুঝি বড্ড চেনাচেনা লাগছিলো!

সামনের ভদ্রলোকটি কলম দিয়ে লিখলেন দু-চার লাইন,

তারপর মুখ তুলে বললেন, 'ব্যস, হয়ে গেছে, আর কষ্ট দেবো না আপনাকে। দিন সাতেকের মধ্যেই চিঠি চলে যাবে আপনার ঠিকানায়।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ছুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড় করলেন।

দেবনাথবাবুর কিন্তু খেয়ালই নেই। চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা লাঠিটা হাতে নিয়ে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করলেন।

গোকুল রায়ের মেয়েই বটে। সে দিনের সে চোখের চাউনি কি ভুল হবার! বছর বারো তেরো আগের ঘটনা, কিন্তু আশ্চর্য একটু ঝাপসা নয়, একটু অস্পষ্ট নয়। চোখের সামনে ফলন্ত তাল সুপুরী গাছগুলো আজ যেমন ভেসে উঠছে, ঠিক তেমনিভাবে মনে পড়ছে সে দিনের প্রত্যেকটি ঘটনার টুকরো।

বউয়ের চিকিৎসার জন্য নিজের বসতবাটিটা পর্যন্ত বাঁধা দিলো গোকুল রায়। আজন্ম রুগ্ন বউ। বিয়ের চার-পাঁচ বছর পর থেকে সেই যে বিছানা নিয়েছিলো, চিতেয় ওঠবার আগে পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও হাঁফ ছাড়তে দেয়নি গোকুলকে। গাঁয়ের ইস্কুলের থার্ড মাষ্টার। কতই বা ছিলো জমানো পুঁজি। প্রথমে থালা-বাসন, তারপর মেয়ে আর বউয়ের গায়ের সোনার চিহ্নগুলো একে একে যাবার পরেই এক রাতে নিঃশব্দে এসে গোকুল দেবনাথবাবুর ছুটো হাতই চেপে ধরেছিলো। এই বিপদে বাঁচাতেই হবে, কোন ওজর-আপত্তি চলবে না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন বটে দেবনাথবাবু, কিন্তু অনুরোধ

এড়াতে পারেন নি। ওই একরত্তি জমি আর দুখানা টিনের চালা, ও রেখে আর কতোই বা দেওয়া যেতে পারে। নাছোড়বান্দা গোকুল, দেবনাথবাবুকে গররাজী হ'তে দিলো না। বিপদ-আপদে পাড়া-পড়শীই যদি না দেখবে তো ভিন-গাঁয়ের লোক কি আর দেখতে আসবে সাত কোশ হেঁটে। দেবনাথবাবু রাজী হয়েছিলেন। অবশ্য গোকুলকে টাকা দেবেন, এর জন্য আবার জমি-জমা ঘরদোর বন্ধক দেবার দরকার কি? লেখালিখি সইসাবুতেরই বা কি প্রয়োজন? কিন্তু সবই হ'য়েছিলো। খালি হাতেই বা ধার করতে যাবে কেন গোকুল, আর দেবনাথবাবুর তরফ থেকেও বন্ধকের ব্যাপার যখন, তখন কানুনমাফিক কাজ হওয়াই ভালো।

সে রাত্রে মা কালীর পটের সামনে দেবনাথবাবু অনেকক্ষণ ধ'রে উপুড় হ'য়ে পড়েছিলেন। জাগ্রত দেবী। মনের কোণের অভিলাষটুকুও ঠিক টের পান। জয় মা কালী। পূবের জমিটা একটু চাপা চাপা ছিলো কেমন বেঢপ প্যাটার্নের। গোকুলের জমিটা আওতার মধ্যে এসে গেলেই—কৈবল্যদায়িনী মা—প্রণাম শেষ ক'রে তিনি উঠে পড়েছিলেন।

দেবনাথবাবু সিঁড়ির চাতালে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। বোশেখের কাঠ-ফাটা রোদ্দুর। একটা পাখপাখালীও নজরে আসছে না। সমস্ত শহরটা যেন ঝিম মেরে বসে রয়েছে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়েই বা কি লাভ। বাড়ী তো নয় যেন ফারনেস। মাথার ওপরে টিনগুলো তেতে কামারের হাপরের

মতন হ'য়ে থাকে। কোনরকমে ভিজে গামছা মাথায় জড়িয়ে সারাটা দুপুর কাটাতে হয়। তার চেয়ে পার্কের গাছের ঘন ছায়ার তলায় সময়টা কাটিয়ে দিয়ে রোদ পড়লেই বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া ভালো।

দেবনাথবাবু শিরীষ গাছের তলায় এসে বসলেন।

কোথাকার লোকের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়ে যায় ঠিক আছে! তিনিই কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন সাজানো সংসার ফেলে এমনি করে অচেনা শহরে এসে তাঁকে হুমড়ী খেয়ে পড়তে হবে। এমন মুখোমুখি দেখা হ'বে গোকুলের মেয়ের সঙ্গে!

বাতাসে ভেসে যাওয়া হালকা মেঘের পুঞ্জের মতন ফেলে আসা ঘটনাগুলো মনের সামনে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো।

গোকুলের বাড়ীর কান্নাকাটির আওয়াজ দেবনাথবাবু দাওয়ায় বসেই শুনেছিলেন। এমন আর কি কান্নাকাটি। একবার শুধু গোকুলের গলার আওয়াজ আর মাঝে মাঝে মেয়েটার বিকৃত গলার শব্দ পাওয়া গিয়েছিলো। কতকটা তো জানাই ছিলো। গাঁয়ের কদমতলার যাত্রাগানের আসরের মতন ভোরের দিকে শেষ হ'য়ে যাবে, টাঙানো ত্রিপল আর সামিয়ানা খুলে নেওয়া হবে এতো বাপ আর মেয়ে কারুরই অজানা ছিলো না কিন্তু দু'জনেই ককিয়ে উঠেছিলো, একটা মানুষের ফুরিয়ে যাওয়ার শোকে নয়, সামনের জমাট অন্ধকার দিনগুলোর কথা ভেবে।

পাওনাদারের দল ওৎ পেতে ছিলো। কবরেজ, গয়লা, ত্রিলোচন মুদী সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সেক্রেটারী-বাবুর কাছে কান্নাকাটি করেও কোন ফল হয় নি। তু'মাসের ওপর স্কুলে কামাই করেছে গোকুল, কাজেই তার জায়গায় নতুন মাস্টার এসেছে শহর থেকে। অসুখ-বিসুখ মানুষের সংসারে আছে বইকি, কিন্তু তা বলে তো শিক্ষক অভাবে ছেলেগুলো মূর্খ হয়ে থাকতে পারে না।

দেবনাথবাবু দেখা করেছিলেন আরো অনেক পরে। জেলে-দের মাছ ধরা তদারক করার জন্য ছাতি হাতে সকালে বেরিয়েছিলেন, পথের মাঝ বরাবর গোকুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিলো।

প্রথমে শুকনো সহানুভূতির কথা, মানুষ যে চিরস্থায়ী নয় সে বিষয়ে দার্শনিক আলোক-পাত, এই নশ্বর প্রবঞ্চনাময় পৃথিবী থেকে যে যত দ্রুত সরে যেতে পারে সেই তত পুণ্যাত্মা, সবশেষে তিনি আসল কথাটা পেড়েছিলেন, টাকা পরিশোধ করার মেয়াদ শেষ হয়েছে দিন সাতেক আগে, এবার গোকুলকে কিছু একটা বন্দোবস্ত করতে হয়।

গোকুল একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলো। পথের মাঝখানেই দেবনাথবাবুর দুটো হাত আঁকড়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিলো, যে রকম ক'রেই হোক আর মাসখানেক সময় তাকে দিতে হবে। একটু সামলে নিক আগে।

দেবনাথবাবু অবিবেচক নন। গোকুলের দিকে একবার চোখ

বুজিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবে গোকুল? কোন জায়গা থেকে কি টাকা আসবার কথা আছে?'

গোকুল কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়েছিলো, তারপর চাইলো দেবনাথবাবুব মুখের দিকে। দুইই সমান নিষ্করুণ। করুণার সামান্য ইঙ্গিতও নেই।

'ওই তো তোমাদের দোষ গোকুল, নেবার সময় এমন ভাব দেখাও যেন ঠিক দিনে পয়সাটি পর্যন্ত হিসেব বুঝিয়ে দেবে আর টাকাগুলো হাতে এলে আর মানুষকে চিনতেই চাও না। বলি আমরাও তো ছাপোষা মানুষ। আমার পূর্বপুরুষ তো আর মোহরের ঘড়া রেখে যান নি। ওই সামান্য টাকাকটা নেড়েচেড়েই তো আমাকে খেতে হয়'—তারপর হঠাৎ কথা বন্ধ করে হন্ হন্ করে গোকুলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন, 'দেখো, আমি আর কি বলবো। তোমার যা ধর্ম হয়, তাই ক'রো।'

গোকুল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো। কিন্তু বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দেবনাথবাবু তাঁর প্রজা নিধিরামকে ডেকে যা আদেশ করেছিলেন, সবই গিয়েছিলো তার কানে। সদরের মানিক উকীলকে বিকেলের দিকে একবার দেখা করবার কথা বলে পাঠিয়েছিলেন।

ছায়াটা সরে যেতে দেবনাথবাবুও আরেকটু সরে বসলেন। [পড়ন্ত রোদটা মুখে লাগা ঠিক নয়, এই বয়সে বিদেশ-বিভূঁয়ে

হঠাৎ একটা অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়লেই মুশকিল।

সদরের মানিক উকীল আসার আগেই গোকুল আর একবার এসেছিলো। আলুথালু ঝোড়ো কাকের মতন চেহারা। কয়েক ঘণ্টাতেই গোকুলের বয়স যেন কয়েকবছর বেড়ে গিয়েছিলো। দেবনাথবাবু টলেন নি। এত অল্পতেই টললে এই সময়ের মধ্যে কারবার এত ফলাও ক'রে তুলতে তিনি পারতেন না। সোজা আঙুলে এ পর্যন্ত কোনদিন ঘি ওঠে নি। যে রোগের যে ওষুধ।

ফুটপাথে কয়েকটা লোক জমে উঠতেই দেবনাথবাবু চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। আর নয়, উঠতে হয় এইবার। নয়তো এখনি পিল পিল ক'রে লোক বেরোতে শুরু করবে। পথেঘাটে ট্রামে-বাসে আর তিলধারণের স্থান থাকবে না।

বাড়ীতে পৌঁছে কি ভেবে দেবনাথবাবু গোকুলের মেয়ের কথাটা গিন্নীর কাছে চেপেই গেলেন। থাক্‌গে, কি থেকে কি হয় কিছুই বলা যায় না। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ।

দিন সাতেক চুলোয় যাক, পুরো চোদ্দ দিন কেটে গেলো, কিন্তু কোন চিঠিপত্তর নয়, কোন খোঁজখবর নয়। দেবনাথবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রোদ্দুর ক্রমেই বাড়ছে। এই টিনের খাপরার মধ্যে সারা গরম কালটা কাটাতে হ'লে আধ সেদ্ধ হয়ে যাবেন। শক্ত অসুখ হ'য়ে পড়বে। তার চেয়ে, লাঠিটা হাতে নিয়ে ভোর ভোর রওনা হ'য়ে পড়লেন।

কোন রকমে সে দিনের হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোকটিকে আলাদা

ক'রে পাওয়া গেলে হয়। সিঁড়ির কোণে কিম্বা করিডরের বাঁকের মুখে পেলে দেবনাথবাবু ঠিক তার হাত দুটো চেপে ধরবেন। যেমন ক'রেই হোক দুঃস্থ ব্রাহ্মণের একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিতেই হবে। কিন্তু গোকুলের মেয়ের সামনে পারবেন না এসব করতে। বড় বড় টানা দুটো চোখ তুলে কেমনভাবে যেন চায় মেয়েটি। ওর চকচকে চোখের তারায় ফেলে আসা রাতের ঘটনাটা স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে ওঠে। অনেক দিনের কথা তো, কিন্তু গোকুল রায়ের মেয়ে কি ঠিক মনে রেখেছে সমস্ত ঘটনাটা। তখন ওর বয়সও ঢের কম ছিলো।

গিয়ে দাঁড়াতেই সে দিনের অফিসারটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'আপনার কার্ডটা যায় নি বুঝি এখনো? আর বলবেন না মশাই, কাজের চাপে মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। ব্যস্ত হবেন না, এ সময়ে আপনারাও যদি একটু ধৈর্য না ধরেন তবে তো আমাদের কাজ করাই দুষ্কর। খবরের কাগজে দেখেছেন তো বাস্তুহারা আসার ঠ্যালাটা। দিন দশেকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ ধাক্কাটা একটু সামলে নিতে দিন। আচ্ছা নমস্কার।' ভদ্রলোক দুটো হাত জোড় ক'রে অমায়িকভাবে হাসলেন।

দেবনাথবাবু কিন্তু সারাক্ষণ চেয়েছিলেন পাশে বসা গোকুল রায়ের মেয়ের দিকে। ভ্রূক্ষেপ নেই মেয়েটির। একমনে মাথা নীচু ক'রে টাইপ ক'রে চলেছে। খুব কাজের চাপ পড়েছে। আজকের কাজের চাপে সে দিনের কথাটা হয় তো ভুলেই গেছে মেয়েটি। দেবনাথবাবুর কথাই মনে নেই ভালো করে, কাজেই

সে সব ব্যাপারও কোথায় তলিয়ে গেছে ঠিক আছে। মিথ্যেই ভয় পাচ্ছিলেন দেবনাথবাবু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই একেবারে দেবনাথবাবুর গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে শুরু করলে একটি লোক। গায়ে ফতুয়া, ডান হাতে তাবিজের স্তূপ, সারা মুখে ধূর্ততার প্রলেপ। বাঁকানো নাক, কোটরে ঢোকা চোখ দুটোর জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে কি একটা অভিসন্ধি মাখানো। শরীরটা বাঁকিয়ে প্রণাম করে বললো, 'হুজুরের কাজ হলো?'

অন্য সময় হ'লে কি হ'তো বলা যায় না, হয়ত দেবনাথবাবু পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতেন লোকটিকে। আজকাল কিন্তু ব্যাপার অন্যরকম।

কেউ সহানুভূতি মাখানো স্বরে কথা বললে ভারি ভালো লাগে। ডিঙ্গিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। এই নির্বান্ধব শহরে আত্মীয়-প্রতিম মনে হয়।

'কই আর হলো। হাঁটাহাঁটি ক'রে পায়ের শিরা ছিঁড়ে গেলো।' দেবনাথবাবু খেদোক্তি করলেন।

'এখানকার এই দস্তুর। ভেতরে লোক না থাকলে কিছু হবার নয়। আপনার পিটিশন লেখাটেখা হ'য়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, ওসব হ'য়ে গেছে বহুদিন, এখন শুধু কার্ড পাবার অপেক্ষাতেই আছি।'

'তবে তো আসল কাজই বাকি' লোকটা ঢোঁক গিলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে শুরু করলো, তারপর একে-

বারে গায়ের কাছে এসে একটা চোখ মটকে বললো, 'অফিসারদের সঙ্গে জানা শোনা নেই? খোদ তাঁদের সঙ্গে না হোক, তাঁদের কারুর শালা কিম্বা জামাইয়ের সঙ্গে? সেই খোঁজ বরঞ্চ করুন, হিল্লে হয়ে যাবে। সব ব্যাপার জানি কিনা। এখানে বসে বছর দুয়েকের ওপর পিটিশন লিখছি।'

দেবনাথবাবু যেন অথই জলে দ্বীপের ইসারা দেখতে পেলেন। চেনা-জানা তো রয়েছে গোকুল রায়ের মেয়ের সঙ্গে, তবে তার কি হাত আছে কিছু?

কথাটা বলতেই লোকটি লাফিয়ে উঠলো, 'বলেন কি, সি, সেক্সনের মিস রয়! কোঁকড়ানো চুল, ফর্সা মেয়েটি, ব্যস ব্যস, তবে তো কাজ হাসিল হয়ে গেছে আপনার। এক গাঁয়ের মেয়ে, আপনার অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না। দেখুন না চেষ্টা করে। সোজা ওঁর বাড়িতে চলে যান একদিন।'

'কিন্তু ওঁর কি বিশেষ হাত আছে? অফিসের সামান্য টাই-পিস্ট', দেবনাথবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

'বলেন কি স্যার, এসব অফিসের ব্যাপারই অন্যরকম। ও ঠিক হয়ে যাবে। কালও দেখলুম ডেপুটি ম্যানেজারের সঙ্গে এক গাড়িতে যাচ্ছেন। আপনি আর দেরি করবেন না।' কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দেবনাথবাবুর দিকে আরো এগিয়ে এলো, তারপর কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বললো, 'হয়ে গেলে গরীবের কথাটা স্মরণ রাখবেন। যে কোনদিন ওই বটগাছটার তলায় আমি থাকি কিম্বা সিঁড়ির এই চাতালে। যাকে জিজ্ঞাসা

করবেন সেই বলে দেবে। অধীনের নাম পাঁচকড়ি সেন। নমস্কার।' লোকটি বারান্দা দিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলো।

দেবনাথবাবু অনেকক্ষণ সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। গোকুল রায়ের মেয়ের হাত আছে তাহলে। তাকে বলে দেখলে হয় একবার। চুপি চুপি বলে দেখবেন, নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে আর রুগ্ন খুড়ির দোহাই দিয়ে। গোকুল রায়ের মেয়ে তো নয়, এখন মিস রয়। পোশাক-আশাক, রঙ-চঙে, পুরোনো দিনের কিছুই আর নেই। সব পাল্টে ফেলেছে। পুরোনো দিনের কথাই কি আর মনে রেখেছে।

মানিক উকীলের চিঠি পাবার পরে গোকুল আর দেখা করে নি। কিন্তু এক সন্ধ্যায় খেয়েদেয়ে খিড়কীর পুকুর ঘাটে আঁচাতে যাচ্ছিলেন দেবনাথবাবু, পায়ে খড়ম, দাঁতে খড়কে। ফ্যাকাশে চাঁদের আলো। খানিকটা পরিষ্কার, খানিকটা আবছা। হঠাৎ পায়ে নরম কি একটা ঠেকতেই দেবনাথবাবু চমকে পিছিয়ে এসেছিলেন। সাপ-খোপ নয় তো! স্বল্প আলোয় এলোচুলের গোছা দেখতে পেয়েছিলেন।

'কে?'

'আমি' কান্নায় ভেজা গলা। গোকুল রায়ের মেয়ে মুখ তুলেছিলো।

মুহূর্তে দেবনাথবাবুর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিলো, 'কি ব্যাপার, তোমার বাপের কি দেখা করতে মান গেল? রাত-বিরেতে মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে এমনি করে।'

'বাবার জ্বর। তিন দিন বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারছেন না। আর মাসখানেক সময় আমাদের দিন। এমনি করে ভিটে-ছাড়া করবেন না।'

দেবনাথবাবু হেসে উঠেছিলেন। এরকম অবস্থার মুখোমুখি এর আগেও অনেকবার তাঁকে হতে হয়েছিলো। নাকে কাঁদুনি, বাজে ওজর, কোন রকমে টাল-বাহানা করে সময় নেওয়া। কিন্তু এ সবে ভুললে কি আর পৃথিবীতে থাকা চলে।

দেবনাথবাবু মুখ থেকে খড়কেটা টেনে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন, তারপর কঠোর গলায় বলেছিলেন, 'সরো, পা ছাড়ো বাছা। বন্ধকের মেয়াদ ফুরিয়েছে, বাড়ির দখল ছাড়তে হবে। এ একেবারে আইনের কথা। আইন ডিঙ্গিয়ে কিছু করা আমার দ্বারা হবে না। অধর্ম আমি কারুর জন্য করতে পারবো না।'

কথা শেষ হবার আগেই গোকুল রায়ের মেয়ে পা ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠেছিলো। টান হয়ে একেবারে দেবনাথবাবুর মুখোমুখি। কথা শেষ হতেই তার চোখ দুটো আধো অন্ধকারে আগুনের শিখার মতন জ্বলে উঠেছিলো। দু-এক মিনিট, তারপরেই মাথা নিচু করে সে বাঁশঝাড়ের মধ্যে মিশিয়ে গিয়েছিলো।

সব বদলে গেছে গোকুলের মেয়ের, কেবল ওই চাউনিটা ছাড়া।

দেবনাথবাবু তক্কে তক্কে রইলেন। এতগুলো লোকের সামনে

মিস রয়ের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে কেমন লজ্জা লজ্জা করলো। তার চেয়ে অফিসের পরে একলা তাকে পেলেই ভালো হয়। মনের কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারবেন একটা একটা করে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে গোকুলের মেয়ে, এতো তাঁর গাঁয়েরই গৌরব। একটার পর একটা ভালো ভালো কথাগুলো দেবনাথবাবু সাজিয়ে রাখেন, কিন্তু সুযোগ আর পান না। বেশির ভাগ দিনই হ্যাটকোট-পরা ছিপছিপে এক ছোকরার পাশাপাশি হেঁটে মিস রয় লাল রংয়ের একটা গাড়িতে গিয়ে ওঠে, নয়তো অফিসের অন্য মেয়ের পালের সঙ্গে কলরব করতে করতে অফিসের গেট পার হয়ে যায়। রাস্তার একপাশে লাঠিতে ভর দিয়ে দেবনাথবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে একসময়ে চলতে শুরু করেন।

দিনকতক পরে দেবনাথবাবু সুযোগ পেয়ে গেলেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের মিটমিটে আলো। একে একে অফিসের অনেকেই চলে গেলো, এমন কি, সেই ছিমছাম ছোকরাটি পর্যন্ত লাল গাড়িতে গিয়ে উঠলো। দেবনাথবাবু চিন্তায় পড়ে গেলেন। হঠাৎ কোন্ ফাঁকে মিস রয় চলে যায় নি তো ?

কিন্তু না, একটু পরেই মিস রয় নামলো সিঁড়ি দিয়ে। বেশ হাসি-হাসি মুখ। হাতের বেঁটে ছাতাটা ঘোরাচ্ছে আস্তে আস্তে। সঙ্গে কেউ নেই। লনে পা দিতেই দেবনাথবাবু এগিয়ে গেলেন।

'কেমন আছো ?'

মিস রয় প্রথমটা একটু চমকে গেলো, তারপরেই সামলে নিলে নিজেকে, 'ভালো, আপনি এ সময়ে এখানে? বাড়ির খবর ভালো?'

'আর ভালো', দেবনাথবাবু নিজের কপালে হাত ঠেকালেন, বুড়ো বয়সে বরাতে এত কষ্টও ছিলো, কে জানতো। তোমার খুড়ির শরীরও খুব কাহিল। মানে এভাবে জীবন কাটানো তো আর অভ্যাস নেই, চিরটা কাল ভালো ভাবেই থেকে এসেছে।'

মিস রয়কে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে দেবনাথবাবু কথার মোড় ঘুরালেন, 'তোমার জন্যই ক'দিন ধরে অপেক্ষা করছি এখানে।'

'আমার জন্য?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কোনদিনই আর একলা পাচ্ছি না তোমাকে।'

'কি দরকার বলুন তো? আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি?' মিস রয় ছাতিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এইবার দেবনাথবাবু আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। দরদ-মাখা মোলায়েম গলার আওয়াজ, 'তুমি ইচ্ছে করলে সবই পারো। এই দেখো না, দু মাসের ওপর হাঁটাহাঁটি করছি তোমার অফিসে, সুবিধা আর কিছুতেই হচ্ছে না। আজ নয় কাল করে কেবলই তারিখ দিচ্ছে। অথচ আমরা বুড়ো বুড়ি কিভাবে যে আছি, দেখলে তোমার কষ্ট হবে। দেবনাথবাবু নীচু হয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিলেন, 'তুমি একবার কর্তাদের বললেই আমার একটা হিল্লে হয়ে যায়।'

মিস রয় ভুরু ছুটো কোঁচকালে, 'কিন্তু আমি বললেই হবে, একথা কে বললো আপনাকে? তাছাড়া যতদূর মনে হয়, আপনার ওপরে এখনও জন পঞ্চাশ রিফিউজীর নাম রেজিস্টার্ড করা রয়েছে। এক-এক করে তো হবে।'

দেবনাথবাবু আবেগে মিস রয়ের হাত ছুটো জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে সামলে নিলেন নিজেকে, 'আমি খবর পেয়েছি, তুমি একবার মুখের কথা খসালেই সব হয়ে যাবে। জন পঞ্চাশেক তো কিছুই নয়, তুমি একবার ডেপুটি ম্যানেজারকে বলে দিলে সবাইকে ডিঙ্গিয়ে আমার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। হাজার হোক, এক গাঁয়ের লোক—'

আরো অনেক কিছু দেবনাথবাবু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিস রয়ের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে আচমকা থেমে গেলেন।

সে-রাতের মতন চোখের ছুটো তারায় আগুনের শিখা নেচে উঠলো। থরথর করে কাঁপতে লাগলো ছুটো ঠোঁট। কানের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠলো। কথা নয়, মিস রয় যেন গলানো শীসে ঢেলে দিলো দেবনাথবাবুর কানে।

'এসব আইনের কথা। অফিসের একটা আইন আছে জানেন তো? আইন ডিঙ্গিয়ে কিছু করা আমার দ্বারা হবে না। অধর্ম আমি কারুর জন্য করতে পারবো না।'

এক-পা, ছু-পা করে দেবনাথবাবু পিছিয়ে এলেন। সে-দিনের মতন শিরীষ গাছের ঘন ছায়ার মধ্যে গিয়ে বসতে পারলে

হতো। গ্যাসের আলোতে সব যেন বড় স্পষ্ট আর উগ্র।

কিন্তু ভারি আশ্চর্য লাগলো দেবনাথবাবুর। শুধু সে-রাতের কথাগুলোই নয়, দেবনাথবাবুর গলার আওয়াজটা পর্যন্ত ঠিক নকল করেছে গোকুল রায়ের মেয়ে।

সিঁড়ি

চিনিসুদ্ধ চায়ের চামচটা কাপের গায়ে ঠেকিয়ে অমিতা দেবী আবার মুচকি হাসলেন, ক' চামচ?

আপনার তৈরী চায়ে চিনি না দিলেও চলবে। চিনির আর কতটুকু মিষ্টত্ব!—রসিকতা কবার চেষ্টা করলাম।

অমিতা দেবী এ কথার উত্তর না দিয়ে চামচটা ডুবিয়ে দিলেন চায়ের কাপে। চুড়ির ঝুনঝুন আওয়াজের তালে তালে চামচ নাড়াতে নাড়াতে বললেন, আমার টেলিফোন পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, না?

ইদানীং কিছুতেই যে আর আশ্চর্য হই না সে কথা বলতে গিয়েও সামলে নিলাম। আজেবাজে কথায় সময়টা নষ্ট করা সমীচীন হবে না। তার চেয়ে আসল বক্তব্যটাই শোনা যাক। অমিতা দেবী শুধু আমার একদা সহপাঠিনীই নন, প্রতিবেশিনীও।

কিন্তু প্রায় বছর দশেক বাইরে কাটিয়ে আসার পরে পুরোনো আলাপের খিলানে মরচে পড়ে গেছে। ঝালিয়ে নিতে হচ্ছে সব কিছু। মানুষটা পুরোনো হ'লে হবে কি, আলাপটা আবার নূতন ক'রেই শুরু করতে হয়েছে।

চা-পানের ফাঁকে ফাঁকে কৌতূহলী দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে মানুষটাকে দেখে নেবার চেষ্টা করলাম। যৌবনের গোধূলি। অমিতা দেবীকে কখনই অপূর্ব সুন্দরী ব'লে মনে হয় নি। যৌবনের খর মধ্যাহ্নেও নয়। আজও হ'ল না। কপালের মাঝখানে সময়ের চুল-সরু আঁচড়, দুটি চোখে ক্লান্তির বিষণ্ণতা, ঠোঁটের ভাঁজে সামান্য ঝুলে-পড়া চিবুকেও বয়সের সঙ্কেত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রী। বই ছাড়া আর কারো দিকে কখনও মুখ তুলে চেয়েছেন এ খবর পাওয়া যায় নি। স্তূপাকার বইয়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে কোন সহপাঠীও হাত বাড়াতে সাহস করে নি। কলেজে গিয়েছেন প্রতিদিন, পাস করেছেন ভালভাবে প্রতি বছর, ওঁর জীবনের রোজনামচায় এর বেশী কিছু লেখা থাকার কথা নয়। কিন্তু জীবনের অলিখিত অংশও তো উপেক্ষার নয়! কালো কালির রেখায় নয়, লাল রক্তের আঁচড়েও অনেক কিছু জমা হয়ে ওঠে। শরীরে কালশিরা পড়ার মতন মনও নীল হয়ে ওঠে অব্যক্ত ব্যথায়।

আজকের টেলিফোনে যেন এমন একটু আভাসই পেলাম।—ছুটির পরে একবার আসবেন দয়া করে। দরকারী কথা ছিল।

অমিতা দেবীর অফিসের ঠিকানা আমার জানা। ছুটির পরে নিশ্চয় যাব কথা দিলাম। টেলিফোন শেষ, কিন্তু ভাবনার শুরু। এতদিন পরে আমাকে মনে পড়ল কেন অমিতা দেবীর, তাও আবার দরকারী কথা বলার ব্যাপারে?

চায়ের সরঞ্জাম সরিয়ে অমিতা দেবী চেয়ারে হেলান দিলেন।

আপনার তো আজকাল বেশ নাম। নানা কাগজে লেখা দেখতে পাই।

বিগলিত হলাম। কিন্তু এটুকু বলবার জন্যই যে অমিতা দেবী ডেকে আনেন নি, তা বুঝলাম। এ প্রশংসাবাদটুকু টেলিফোনেও বলতে পারতেন, তার জন্য মানুষটাকে ডেকে পাঠাবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আমার একটি বান্ধবীর জীবনকাহিনী আপনাকে শোনাব, যদি ভালো লাগে, গুছিয়ে গাছিয়ে গল্প লিখে ফেলবেন একটা। পূজোর মরশুম তো সামনে।

খুব উৎসাহ বোধ করলাম না, এ ধরণের ব্যাপার এর আগেও একাধিকবার হয়েছে। আত্মীয়াদের মধ্যেই। ছোট কাকীমা বঁটি পেতে আনাজ কুটতে কুটতে কাছে ডেকে বসিয়েছেন,—অমু, তুই তো গল্প লিখিস, তোর ছোটকাকার কালকের ব্যাপারটা একটু লিখে দিতে পারিস কোথাও? মানুষ-টাকে সবাই চিনতে পারুক। ছি, ছি, ঘেন্নায় মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছে। মাথা কোটার চেষ্টা করলেন না বটে, কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ আক্রোশ গিয়ে পড়ল হাতের অপুষ্ট পেঁপের ওপরে। দ্বিগুণ

বেগে সেটিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন।

কিছু একটা বলা উচিত এই ভাবেই বললাম, ব্যাপার কি?

কি নয় তাই বল্‌!—ছোট কাকীমা চোখ দুটো বড়ো করে ফেললেন, কাল মাইনের টাকাটা সমস্ত ঘুচিয়ে এসেছেন ঘোড়ার পেছনে। এখন সারাটা মাস কি ভাবে কি হবে বল্‌ দিকিনি।

বলবার কথা আমার নয়। প্রায় প্রতি মাসেই এই অবস্থা। আবার চ'লেও যায় ঠিক।

লিখব ছোট কাকী, নিশ্চয় লিখবো। কোথাও দেবার আগে তোমায় দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

আর ওই সঙ্গে আমার কথাও একটু জুড়ে দিস। কি ভাবে মাসের পর মাস একটা একটা ক'রে গায়ের সোনা খুইয়ে খুইয়ে সংসার চালাচ্ছি, তা তো জানিসই সব।

জানি। আবার মাঠের উপরি পাওনা থেকে আড়াই প্যাঁচের অনন্ত আর তেঁতুলপাতা প্যাটার্ন হারও যে অঙ্গে উঠছে সে খবরও আমার অজানা নয়।

অমিতা দেবীর বান্ধবীর কাহিনীও যে সেই গোছের এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয়। কাহিনীর শেষে হয়তো ঘুড়ির ল্যাজের মতন নিজের কথাও অমিতা দেবী যোগ করে দেবেন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, বলে যান। আমি তৈরি।

অমিতা দেবী মুচকি হাসলেন, দাঁড়ান, আমি তৈরি হয়ে নিই।

সাবধানে ফাইলগুলো সরিয়ে রাখলেন একপাশে, তারপর

টেবিলে ভর দিয়ে শুরু করলেন। খুব নিস্তেজ গলা।

স্নলেখাকে আপনি চেনেন না। স্নলেখা রায়চৌধুরী। সে আমার অফিসের বন্ধু।

চিনি না সে কথা স্বীকার করলাম। কোনদিন যে দেখেওছি এ কথাও মনে করতে পারলাম না।

এক মিনিট অমিতা দেবী থেমে রইলেন। হাত দিয়ে কাচের কাগজ-চাপাটা সরাতে সরাতে বললেন, আমার মনে হয় স্নলেখার জবানীতে আরম্ভ করাই ভাল, কি বলেন?

এবার মুচকি হাসবার পালা আমার। বললাম, যাতে ভাল হয় তাই করুন। নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু নেওয়ার চেষ্টা করব।

অমিতা দেবী হাত দিয়ে ভেঙে-পড়া খোঁপাটা ঠিক করে নিলেন। কপালের ওপর উড়ে-আসা দু-একটা অবাধ্য চুলকে শাসন ক'রে বললেন, এ কাহিনীতে নীরের ভাগ কম, সবই ক্ষীর। নীর যেটুকু আছে তা চোখের।

হাত-ঘড়ির দিকে আলতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, এবার আরম্ভ করুন।

—ফাইলটা নিয়ে মিস্টার ঘোষালের ঘরে ঢুকতেই মিস্টার ঘোষাল চেপে ধরলেন শুধু ফাইলটাই নয়, ফাইলসুদ্ধ হাতটাও। এখানে আমি অর্থে স্নলেখা রায়চৌধুরী তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

ছোট্ট ক'রে উত্তর দিলাম, যা বোঝবার ঠিক বুঝছি। আপনি বলে যান।

—আমি চমকে উঠলাম, এ কি করছেন আপনি? হাত ছাড়ুন। মিস্টার ঘোষাল আকর্ণ হাসলেন। সুগৌর মুখে রক্তের ঝলক। বললেন, ছাড়বার জন্য কি আর ধরেছি! শনিবারের অফিস। অবস্থা ভাঙা-হাটের সামিল। ঘড়িতে দুটো বাজবার আগেই প্রায় ফাঁকা। ছড়ানো ছিটানো ভাবে যে দু-চারজন আছেন তাঁরা আড়াইটে বাজার অপেক্ষায়। তারপর গুটি গুটি সিনেমামুখী হবেন। তা ছাড়া মিস্টার ঘোষালের পার্টিশন-ঘেরা কামরা। বাইরের লোকের দৃষ্টি পড়ার কথা নয়। কিন্তু নাইবা দেখল বাইরের লোক, নিজের অন্তরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না? একশো আটাশ টাকা মাইনের মেয়ে-কেরানীর সঙ্গে সাড়ে আটশো টাকা মাইনের অফিসারের কিসের এত ঘনিষ্ঠতা!

কিসের যে ঘনিষ্ঠতা তা আমিও অনেক ভেবে চিন্তে বুঝতে পারি নি। পথে ঘাটে দেখা হ'লেই মিস্টার ঘোষাল মোটর থামিয়েছেন। ষ্টিয়ারিং থেকে হাত সরিয়ে দরজা খুলে দিয়ে হেসেছেন, আসুন মিস রায়চৌধুরী। কোন্ দিকে যাবেন?

মালিকের উদারতার তুলনায় গাড়ি বেশ ছোট। শুধু পাশাপাশি দু'জনের বসা চলে। গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে বার বার দু'জনের দেহে দেহে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছে। অবশ্য সে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছে অসাবধানতায়, টাল সামলাতে না পারার জন্য। কিন্তু আজকের মতন এমন ভেবে-চিন্তে আট-ঘাট বেঁধে হাত ধরার কি মানে থাকতে পারে!

কি যে মানে থাকতে পারে তা মিস্টার ঘোষাল নিজের মুখেই বললেন। আরও নিবিড় ক'রে দুটো হাত ধ'রে। কথাগুলো শুধু কানেও নয়, মরমেও পৌঁছলো। শ্যামাঙ্গী, কাজেই মুখের রঙ সিঁদুর-ঘেঁষা হ'ল না বটে, কিন্তু মাথাটা আপনা থেকেই নিচু হ'য়ে পড়লো টেবিলের ওপর। চুলের রাশ ভেঙে মিস্টার ঘোষালের দুটি হাত ঢেকে ফেলল, অবশ্য সেই সঙ্গে আমার দুটি হাতও।

সেদিন অফিস থেকে বেরোতে প্রায় সন্ধ্যা। অন্ধকার চেম্বারে যে কথার শুরু হয়েছিল, আলো-ঝলমল পথে নেমেও সে কথার জের মিটল না। এক হাতে মিস্টার ঘোষাল ষ্টীয়ারিং ধরলেন, আর এক হাতে আমার দুটি হাত। মোটর নিয়ে বিপথে ঘোরা সম্ভব নয়, কিন্তু যে পথে ঘোরা হ'ল তা আর যাই হোক বাড়ি ফেরার পথ নয়।

সারা রাত বিছানায় ছটফট করলাম। বিনিদ্র রাত্রি এর আগেও অনেক বার কেটেছে। মধ্যবিত্তের সংসারে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের কমতি নেই। কিন্তু সে রাতের ছটফটানির ধরণ আলাদা। নেশার ঘোরে রাত ভোর হ'ল।

এমনি দিনের পর দিন। অফিসে পুরুষ কেরানীদের হাসি-টিটকারীর ফাঁকে সহকর্মিনীদের বাঁকা চাউনীও চলল। অঙ্গভঙ্গী থেকে ক্রমে ভাষায় মুখর।

ছুটির দরখাস্ত। উল্টো রথের। সবাই আমাকে ছেঁকে ধরল—মিস রায়চৌধুরী, আপনি নিয়ে যান দরখাস্ত। মিস্টার

ঘোষালকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে আম্বন।

আমি!

চোখে চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। বাঁকা ঠোঁটের হাসির ধরণও স্থবিধার নয়।

আপনি গেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিব্রত ভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই কানের কাছে শান্তিদির গলা, 'নিজের দরখাস্তটাও ওই সঙ্গে পেশ করে এসো। গৌরচন্দ্রিকা তো চলল অনেকদিন ধরে, এবার আসল পালা জমুক।'

কারুর কথারই কোন উত্তর দিলাম না, দরখাস্তটা নিজেই নিয়ে গেলাম। ছুটিও মঞ্জুর হ'ল। কিন্তু আসল পালা জমল অনেক পরে।

সিনেমার বাতি নিবতেই মিস্টার ঘোষালের দুটো চোখ জ্বলে উঠল। একটা হাত নিজের দুটো হাতে তুলে নিয়ে ফিস-ফিসিয়ে কথাগুলো বললেন। মন কিছুটা তৈরিই ছিল, কিন্তু তবু সামনের পর্দার দুলেদুলে-ওঠা ছবিগুলোর মতন সারা শরীর দুলে উঠল। পরিবেশ ভুলে মাথা ওঁর বুকের ওপর চেপে ধরলাম।

মিস্টার ঘোষাল বাবার কাছে যেতে চাইলেন। মেয়ের মনের খোঁজ পাওয়া গেছে, তবু মেয়ের বাপের কাছে যাওয়া দরকার। সামাজিকতা তো আছে একটা।

কল্পনা করতে পারলাম বাপ শশীমোহন রায়চৌধুরীর

অবস্থা। আধা সরকারী অফিসের মাঝারী কেরানী। মাইনে আর উপরি মিলিয়েও যা হাতে আসে, বাড়িভাড়া আর বাড়ির লোকের খোরাক মেটাতে তা যথেষ্ট নয়। ছেলে দুটি অপোগণ্ড। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে ব্যস্ত। সম্বল ওই মেয়েটি। গোড়ার দিকে বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, সুবিধা হয় নি। পাত্রপক্ষ খাবারের থালা শেষ করেছিলেন, কিন্তু বিয়ের কথা-বার্তা পাকা করেন নি। কিংবা যাঁরা আধপাকা করেছিলেন, তাঁদের চাহিদার বেড়াজালে শশীমোহন আটকে পড়েছিলেন। এগোতে পারেন নি। মরীয়া হয়ে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেছিলেন। তারপর ধরাধরি ক'রে এই চাকরীতে বহাল।

আমার শুধু ভয়, সাড়ে আটশো টাকার হবু জামাইয়ের বৃত্তান্ত শুনে পাঁজরা-সর্বস্ব শশীমোহন মূর্ছাই না যান।

ভালোয় ভালোয় সব শেষ হ'ল। দোরগোড়ায় মোটর থামতে আশপাশের অনেকগুলো জানলাই খুলে গেল। খড়খড়ির ফাঁকে ঈর্ষা-চকচক চোখের সার। খাটো-ধুতি আর হাতা-কাটা ফতুয়া গায়ে শশীমোহন চৌকাঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর মারফৎ কথাটা কিছু শুনেওছিলেন। মিস্টার ঘোষালের মুখ থেকে কথাটা শুনে বিগলিত হলেন। বললেন, মিনুকে পায়ে রাখবেন, আর কি বলব। এ আমার কল্পনারও অতীত।

মিস্টার ঘোষাল কোন উত্তর দিলেন না। বুকে রাখা মেয়েকে পায়ে রাখতে বলার কোন মানে হয়? এ যেন ডেপুটিকে দারোগা হতে বলার আশীর্বাদ। মাও কম খুশী হলেন

না। অপোগণ্ড ভাই দুটির উল্লাস সব চেয়ে বেশী। বোনের কল্যাণে, চাকরি-বাকরীর একটা হিল্লে হ'য়ে যেতে পারে।

সামনে ভরা বর্ষা, তা ছাড়া মিস্টার ঘোষালেরও কি একটা অসুবিধা ছিলো। অগ্রাণ মাসেই বিয়ের দিন ঠিক হলো। গোটা চারেক শুভদিন আছে সারাটা মাস ছিটিয়ে, তার মধ্যে একটা বেছে নিলে হবে।

অমিতা দেবী এখানে একটু থামলেন। জয়পুরী বটুয়া থেকে রঙীন রুমাল বের ক'রে আলতো মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন, পাউডার বাঁচিয়ে। দু হাতের তালুতে থুতনি রেখে মুচকি হেসে বললেন, খুব বোরিং লাগছে, না?

হাসি ফেরত দিয়ে বললাম, এখনও লাগে নি। সুলেখা আর মিস্টার ঘোষালের বিয়েটা হ'য়ে গেলেই লাগবে।

সে কি? কেন?

যার সঙ্গে প্রেম, তারই সঙ্গে বিয়ে বড্ড জোলো মনে হয়। গতানুগতিক।

বটে!—অমিতা দেবী ভুরু নাচালেন, শুনুন তারপর।

এতদিন সহকর্মিনীদের ঠাট্টা টিটকিরির প্রতিবাদ করতাম। ভুরু কুঁচকে বলতাম, ও কি অসভ্যতা! বিন্দুতে সিন্ধু দেখছ যে সবাই! কাজ নিয়ে অফিসরের ঘরে যেতে আসতে হয় বইকি। আর উনি মাঝে মাঝে মোটরে লিফ্‌ট দেন, সে ওঁরই বদান্যতার পরিচয়।

কিন্তু আজকাল মিস্টার ঘোষালের চেম্বার থেকে বেরোবার

সঙ্গে সঙ্গে কানে আসত আলতো উলুর শব্দ, দু হাত মুখের কাছে জড়ো করে শাঁখের আওয়াজের অনুকরণ। রাগ তো হতোই না, বরং নিজের সীটে বসতে বসতে বলতাম, মরণ তোমাদের। এটা অফিস, না, বিয়েবাড়ি?

ফাইল থেকে মুখ না তুলে পাশে বসা রমা মজুমদার বলতো, আমাদের জিজ্ঞাস্যও তো তাই।

এমনি চলল শ্রাবণ ভাদ্র দুটো মাস। বৃষ্টি থামল। সোনা রং ভোরের রোদে। আকাশের ছেঁড়া মেঘের টুকরো গেঁথে গেঁথে জাল বুনতে শুরু করলাম। মধ্যে আর দুটো মাস। তারপর চেম্বারের ও-পাশের লোকটা আরো কাছে সরে আসবে। সুলেখা রায়চৌধুরী হবে সুলেখা ঘোষাল।

আশ্বিনের মাঝামাঝি পূজোর বাজনার সঙ্গেই অফিসে নতুন লোক আমদানী হ'ল। আনকোরা নয়, দিল্লী-ফেরত। প্যাঁচানো শাড়ী, দুঃসাহসিক ব্লাউজ আর হাই হিল জুতোর সঙ্গে তাল রেখে দীর্ঘ গৌরাঙ্গী মেয়ে। রুজ আর লিপস্টিকে কালীঘাটের রঙচঙে মাটির পুতুলের সামিল। কিন্তু মাটির পুতুল কি আর অত তুবড়ী ছোটায় মুখে! ইংরেজী বুকনী আর হিন্দির মিশেল! কচিৎ লাগসই দু-একটা বাংলা! চাকরীতে আমারই স্বগোত্র—পদবী আর তলবে, কিন্তু হাবে ভাবে ডিরেক্টরকেও ছাড়িয়ে গেল।

হাত দিয়ে রিমলেস নাকের ডগায় চেপে ভুরু কোঁচকালো, সর্বনাশ, এক পাখায় চার জনকে হাওয়া খেতে হবে। কথাটা

বলল অবশ্য ইংরেজীতে, কিন্তু ঢংয়ে মনে হ'ল এ যেন একটি পুরুষকে নিয়ে বারোজনের ঘর করার সামিল।

আপনি একটু এগিয়ে আসুন না, তা হ'লেই হাওয়া পাবেন।—আমি বললাম খুব ভয়ে ভয়ে।

মেয়েটি মুখ তুলে চাইলো। দেখলো আপাদমস্তক। কি মনে ভাবলো কে জানে! চেয়ার টেনে পাখার কাছ বরাবর বসলো।

সাজ পোষাকের চটক দেখে যা ভাবা গিয়েছিলো আসলে তা নয়। কৃত্রিম প্রসাধনের তলায় চাপা-পড়া মনটা খুব নিন্দার নয়। নাম বীণা বাগচী, লরেটোতে পড়া মেয়ে। চাকরী শুধু নিছক শখ। মাসান্তে পাওয়া মাইনের টাকা মাসের সাত দিনেই খতম। জোরালো পার্টি আর তিনটে ক্লাবের চাঁদায়।

আসন্ন সন্ধ্যা। অফিসের সকলেই চলে গিয়েছে। পার্টিশনের আড়ালে কেবল মিঃ ঘোষাল আর আমি। ইংরেজপাড়ায় কোন হালকা সিনেমা দেখে কাটাবো তারই প্রোগ্রাম চলছিলো। হঠাৎ পার্টিশনের দরজা কেঁপে উঠতেই চমকে সরে বসলাম। একটা হাত মিঃ ঘোষালের দৃঢ় মুষ্টি থেকে ছাড়াতে ছাড়াতেই ধরা পড়ে গেলাম। দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে বীণা বাগচী। ব্যাপারটা বুঝে নিতে কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই মুচকি হেসে বললে, মাপ করবেন মিঃ ঘোষাল, স্যাচেলটা ফেলে গিয়েছিলাম, নিতে এসে আপনার চেম্বারে আলো দেখে উঁকি দিয়েছিলাম। কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নয়।

মিঃ ঘোষাল সামলে নিলেন, ঠিক আছে, মিস রায়চৌধুরী আমার বাগ্‌দত্তা। ব্যাপারটা আপনার জানা নেই বলেই হয়তো বিসদৃশ ঠেকছে।

Really। বীণা বাগচী আনন্দে যেন ফেটে পড়লো, এক হাত আমার দিকে বাড়িয়ে বললে, Congratulation lucky girl। আজকাল মেয়েদের সুপাত্র পাওয়াই দুর্লভ। একটু বসতে পারি ?

নিশ্চয় নিশ্চয়।—মিঃ ঘোষাল নিজে উঠে বাড়তি চেয়ারের বন্দোবস্ত করলেন। ফাইল সরিয়ে স্যাচেল রাখার জায়গাও ক'রে দিলেন।

দিন তিনেক আগে আমাকে দেখতে একটি পাত্র এসেছিল। বীণা চৌকো রুমালে আলতো মুখ মুছতে মুছতে বললে, খোঁচা খোঁচা চুল, কুতকুতে চোখ—বোধ হয় দাদার পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা থেকে ? বললে, আলিপুর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, সেখানে তো বেশ ছিলেন, এ পাড়ায় কেন ? ভদ্রলোক রসিকতাটা বুঝলেন না। চটে-মোটে স্থান ত্যাগ করলেন।

কথা শেষ ক'রেই বীণা হাসিতে ভেঙে পড়ল। আমরাও না হেসে পারলাম না।

নড়ে চড়ে ভাল হয়ে বসে বীণা আবার জিজ্ঞাসা করলে, মিস রায়চৌধুরী, চুপি চুপি কাজ সারবেন সেটি হচ্ছে না। বিয়ের রাতে তো পেট পুরে খাবই, এমন একটা সুসংবাদ দিলেন

শুধু মুখে ?

কুণ্ঠাজড়িত গলায় বললাম, কি করব বলুন ?

সিনেমায় নিয়ে চলুন একদিন। বেশী ঝামেলা নয়, কেবল আমরা তিনজন।

বেশ তো, আজই চলুন। এখনও সময় আছে।—কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়ির ওপর মিঃ ঘোষাল আলতো চোখ বোলালেন।

আবার মুচকি হাসল বীণা, পাগল, একবার আচমকা ঢুকে আপনাদের অভিশাপ কুড়োচ্ছি, আবার সিনেমার সাথী হয়ে আপনাদের গালমন্দ খাব ? আজ নয়, আর একদিন।

তাই ঠিক হ'ল। সামনের শনিবার। অফিসের পরে একটু এদিক ওদিক ক'রে ছটার শোতে কোথাও গেলেই হবে। টিকিট কেনার ভার মিঃ ঘোষালের, পয়সা অবশ্য আমার।

কিন্তু অদৃষ্ট। ঠিক অফিস যাবার মুখেই বিপত্তি। রান্নাঘরে মা মাথা ঘুরে পড়লেন। মাথার অবশ্য আর দোষ কি! মধ্যবিত্ত সংসারে যে-কোন ব্যাধিই একটা বিলাস। তার ওপর একটানা সংসারের ঘানি। চোখ-বাঁধা বলদের সামিল। ওষুধপত্র এনে দিলেও মা সন্তর্পণে সরিয়ে রাখেন। অনুযোগ করলে মুচকি হাসি।—আমার জন্য ব্যস্ত হ'স নি। নিজেদের শরীরের যত্ন কর্। সেই ভোর ন'টায় দু মুঠো মুখে দিয়ে ছুটবি, ফিরবি সন্ধ্যা ছটায়। শরীরের কি হাল হয়েছে দেখেছিস আয়নায় ?

বাড়ি ফাঁকা। বাবা বেরিয়েছেন ভোর ভোর। দিল্লী থেকে বড়কর্তা আসবেন অফিস তদারকে। আধা-সরকারী অফিস

হ'লে হবে কি, কায়দা কানুন সরকারকে হার মানানো। ভাইদের কথা বাদ। শুধু খাবার সময় ছাড়া বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্কই কম। কাজেই মুস্কিলেই পড়ে গেলাম। পাশের বাড়ির বউদিকে ডেকে মার কাছে বসিয়ে ছুটলাম মোড়ের ডাক্তারখানায়। মার উঠে বসে ঠিক হ'তে দুপুর গড়িয়ে গেল। খাওয়াদাওয়া সারতে বিকাল। বাবা বাড়ি ফিরতে আর এক দফা হৈ-চৈ শুরু হ'ল। দাম্পত্যজীবনে কে বেশি অসুখী তাই নিয়ে কথা-কাটাকাটি। সন্ধ্যার ঝোঁকে দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ। দরজা খুলেই সরে এলাম। মিঃ ঘোষাল, বোধ হয় সিনেমা-ফেরত।

কি ব্যাপার! অফিসে যাও নি যে?

এতক্ষণে মনে পড়ল?—গলার আওয়াজে অভিমানের মেশেল।

আর ব'লো না।—রুমাল দিয়ে মিঃ ঘোষাল কপাল আর ঘাড় মুছে নিলেন। শুধু ঘামই নয়, সারাদিনের পরিশ্রান্তিও। যা জিনিষ ঘাড়ে চাপিয়েছিলে, প্রাণ যায়।

প্রাণ যাবার কোন লক্ষণ অবশ্য দেখা গেল না। বোঝা গেল, আমি না গেলেও বীণা বাগচী ছাড়ে নি। ঘোষালেরই পাশে বসে সিনেমা দেখেছে, হয়তো ঘোষালেরই ঘাড় ভেঙে। কিন্তু মনের এ অবস্থায় এ নিয়ে আর তর্ক করতে ইচ্ছা করলো না। মার শরীর খারাপের কথা জানালাম। মিঃ ঘোষাল ভিতরে এসে বসলেন। মার সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা, বাবার সঙ্গেও তাই। কেবল যাবার সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, অনেক

কথা আছে, কাল ছুটির পরে চেম্বারে এসো।

ছুটির পরে নয়, লাঞ্চের সময় চেম্বারে গিয়ে ঢুকলাম। তার আগেই বীণা বাগচীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে বার কয়েক। মুচকি হেসেছে। আর কোন কথা বলে নি। মিঃ ঘোষাল ফাইলের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ফিরে চাইলেন।—তুমি তো এলে না, সকাল থেকে মিস বাগচী অন্ততঃ পাঁচবার আমার চেম্বারে এসে-ছেন। তাগাদার ওপর তাগাদা। তোমাকে ছাড়া সিনেমা যাবো কি না? বললাম, যাবো, তার আগে একবার মিস রায়চৌধুরীকে দেখতে যাবার ইচ্ছা আছে। ঠোঁট উল্টে বললেন, তবেই আপনি গিয়েছেন! যদি দেখেন মিস রায়চৌধুরী অসুস্থ, তা হ'লে মাথায় হাত দিয়ে আপনিও বসে পড়বেন পাশে। তর্ক করলাম না। জল ঘোলাতে ইচ্ছা করল না। তলার পাঁক ওপরে এসে উঠবে, তার চেয়ে সিনেমা-ফেরতই যাবো তোমার কাছে, এই ঠিক করলাম। আমার মুখের দিকে চেয়েই মিঃ ঘোষাল থেমে গেলেন। কালো মেয়ের ছল ছল দুটি কালো চোখের দিকে নজর পড়ে থাকবে।

কি হ'লো, মেঘ-থমথম মুখ যে?

ভয় নেই, জল ঝরবে না। 'যাহার ঢলঢল নয়ন শতদল তারেই আঁখিজল সাজে গো' তা আমি জানি। কথা শেষ করেই নিজের সীটে চলে এলাম। কিন্তু এসেই ভুল ভাঙলো। এ কি ছেলেমানুষী শুরু করেছি! নবযৌবনার ছলাকলা চাকুরে মধ্য-

বিত্ত মেয়ের বুঝি সাজে ! এ অভিমান কার ওপর।

ত্রুটি শোধরাতে ছুটির পর আবার চেম্বারে ঢুকলাম। অফিস খালি হবার পর। সিগারেট ধরিয়ে মিঃ ঘোষাল সবে ওঠবার আয়োজন করছিলেন, বাধা দিলাম, রাগ করলে নাকি ?

বেশ মেয়ে ! রাগ করে নিজেই তো ছিটকে পড়লে !

ক্ষমা চাইতে এসেছি।—এদিক ওদিক দেখে মিঃ ঘোষালের একটা হাত তুলে নিলাম নিজের হাতে।—রাগ তো নয়, অভিমান। অফিসে যে এলাম না, একটা বেয়ারা পাঠিয়েই তো খবর নিতে পারতে ?

মিঃ ঘোষাল হাসলেন, হনুমানদূত না পাঠিয়ে শ্রীরামচন্দ্র নিজেই সীতার সকাশে যাবেন, এই ঠিক ছিলো।

মন্দোদরী বাধা দিলেন বুঝি ?

মিঃ ঘোষাল স্মিতহাস্য আকর্ণ রূপান্তরিত করলেন, দোহাই তোমার, রাগের মাথায় রামায়ণ অশুদ্ধ ক'রো না। মন্দোদরীর ওপর শ্রীরামের ঝোঁক থাকলে আবার তাঁকে বিভীষণের সঙ্গে লড়তে হতো। যাক, আসল কথা শোনো, বীণা বাগচী মেয়েটিকে সাবধান।

কারণ ?

এখানে নয়, চলো বেরিয়ে পড়া যাক। রাস্তায় যেতে যেতে বলবো।

রাস্তায় নয়, কথা হ'লো এক রেস্তরাঁয় বসে—দু কাপ চা সামনে রেখে। কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও

কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইলো। নড়তে গেলেই খচ করে ওঠে। বীণা বাগচী শুধু নিজের কথাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে নি, আমার ওপরও কটাক্ষ করেছে। এমন একটা সাদা-মাটা মেয়েকে কেমন করে মিঃ ঘোষালের চোখে ধরলো সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত।

দিন সাতেক পরেই মিঃ ঘোষালের চেম্বারে ডাক পড়লো। ঘড়ির কাঁটায় ছুটির নিশানা। অফিসের অনেকেই পাততাড়ি গোটাতে শুরু করেছে। আমি ঢুকতেই মিঃ ঘোষাল চোখ তুললেন, কি, অফিস থেকেই যাবে, না, বাড়ি ঘুরে আসবে?

থমকে দাঁড়ালাম, কোথায়?

বীণা বাগচীর ওখানে?

মিঃ ঘোষালের কথাটাই আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলাম। ব্যাপার বুঝতে মিঃ ঘোষালের দেরি হ'ল না। প্যাডের তলা থেকে নিয়ে হাত বাড়িয়ে কার্ডটা সামনে ধরলেন। হাতে লেখা নয়, দস্তুরমত ছাপা। বীণা বাগচীর জন্মদিনে সামান্য আয়োজন। সন্ধ্যা সাতটায়। চোখ বুলিয়েই মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম, আমাকে নিমন্ত্রণ করলে তো আর মাইনে বাড়বার আশা নেই।

জালটা সেই জাতীয় ব'লেই কি মনে হচ্ছে?—মিঃ ঘোষা-লের কপালে হিজিবিজি আঁচড়।

নাও হ'তে পারে।—আমিই ঘুরিয়ে নিলাম কথাটা। সোজা নিমন্ত্রণপত্রকে অত প্যাঁচালো ক'রে তুলছ কেন?

কি জানি, আমাব মনটাই বুঝি প্যাঁচালো।

চেয়ার ঘুবিয়ে মিঃ ঘোষাল উঠে পড়লেন। দাঁড়ালেন জানালার কাছ বরাবব। দু পকেটে আকব্জি হাত ডুবিয়ে।

কি, যাবে না? যাওয়া কিন্তু উচিত। না গেলেই কি কথা উঠবে জান, আমাকে বাদ দিয়েছে ব'লে তুমিও যাও নি।

সে রকম ভাবাটা কি অন্যায় হবে?

অন্যায় বইকি, একশোবাব অন্যায়।

মিঃ ঘোষাল পায়চারি শুরু করলেন। কোন কথা নয়। চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে নিজের সীটে ফিবে এলাম। দু হাতে মাথাটা চেপে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। আর একবাব উঠে মিঃ ঘোষালের রুমে উঁাক দিয়ে দেখলাম ঘর খালি। কোন এক ফাঁকে মিঃ ঘোষাল নেমে গিয়েছেন।

মিঃ ঘোষাল যে বীণা বাগচীব বাড়িতে গিয়েছিলেন, সে খবর পেলাম পরের দিন বীণারই মাবফৎ। কিছু বাড়তি খবরও। মিঃ ঘোষাল নাকি চমৎকার আবৃত্তি করতে পাবেন। পাবেন যে সে খবর আমার অজানা নয়। বর্ষামুখর সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেনের ছাউনির তলায় সে পরিচয় পেয়েছি, বেলুড় থেকে দক্ষিণেশ্বরের পথে ফুলে ফুলে ওঠা গঙ্গার ওপব নৌকাব নাচনের তালে তালে অনেকবার শুনেছি সে উদাত্ত কণ্ঠ। কিন্তু তবু যেন এ কথাটা বীণা বাগচীর মারফৎ শুনতে মোটেই ভাল লাগল না। হয়তো ঈর্ষা, হয়তো ভয়, কিন্তু সারাটা দিন আনমনা কাটল। একটা

চিঠি লিখতে গোটা পাঁচেক ভুল, এক ফাইল আনতে আর এক ফাইল আনলাম, সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলাম ঘড়ির কাঁটার দিকে। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এলাম। মিঃ ঘোষালের চেম্বারের দিকে নজর না দিয়ে।

বাড়িতে পা দিয়েই ভুল ভাঙল। মধ্যবিত্ত মেয়ের আবার অভিমান, তার আবার ইজ্জত! এমনি ক'রেই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে বুঝি মানুষে! তারপর সারাটা জীবন কপাল চাপ-ড়ানো ছাড়া আর অন্য উপায় থাকবে না। বীণা বাগচীর পায়ে পায়ে এগিয়ে আসায় রাগের কারণ কি থাকতে পারে! সারাটা রাত মনকে অনেক বোঝালাম, কিন্তু তবু বিনিদ্র চোখের জলে বালিশ ভিজলো। পরের দিন চেহারা দেখে মা শিউরে উঠলেন, না বাপু, তোর আর চাকরি বাকরি ক'রে দরকার নেই। কি চেহারা হয়েছে, আয়নায় একবার দেখেছিস?

দেখি নি, কিন্তু দেখেও যে কি ফল তাও বুঝলাম না। চেহারা ভাল করার জন্য অফিস ছেড়ে বাড়িতে ব'সে থাকলেই যদি চলে মন্দ কি! জমিদারীর আয় থেকে সংসার চলবে বোধ হয়। এত দুঃখেও হাসি এলো মায়ের কথায়।

অফিসে গিয়ে হাজিরা-খাতা সই করার আগেই মিঃ ঘোষালের কামরায় ঢুকলাম।

মিঃ ঘোষাল নিচু হ'য়ে জুতোর ফিতে বাঁধছিলেন, পায়ের শব্দে মুখ তুললেন, কি ব্যাপার! কাল সমস্ত দিন কোথায় ছিলে?

কেন, অফিসে।—দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিলাম।

কই, আসো নি একবারও! পাঁচটা বাজতেই খোঁজ করলাম, শুনলাম চলে গিয়েছো।

কাল আর আসতে সাহস হয় নি।

কেন?

আগের রাতে আবৃত্তি ক'বে অত বাহবা পেয়েছো, তারই স্মৃতিমন্থনে মশগুল, সে সময় বিরক্ত কবাটা কি ঠিক হতো?

মিঃ ঘোষাল কোন কথা বললেন না। চোখের কোণ দিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। দৃষ্টি দিয়ে মাপজোপ করার মত। একটু পরে হেসে বললেন, Jealousy, thy name is woman.

তাই যদি হয়, অন্যায়টা কি বলো?—হাজার শাসন সত্ত্বেও মন বিশ্বাসঘাতকতা করলো। চোখেব কোণে টলমল ক'রে উঠল জলের ফোঁটা। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেও তার কাঁপন থামাতে পারলাম না।

মিঃ ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠে কাছে আসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অফিসে কেরাণী-সমাগম শুরু হয়েছে। অন্তরঙ্গতা সমীচীন হবে না। কথাটা হয়ত সবাই জানে। কিন্তু সরকারী অফিস বাসরঘর নয়—এ বোধটা থাকা উচিত বৈকি। চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে মিঃ ঘোষাল বললেন, ছুটির পরে একবার এসো। তোমার পাগলামি থামাবার চেষ্টা করবো।

নিজের সীটে বসে বসেই সব দেখতে পেলাম। ছল ছুতো

করে বীণা বাগচী বার তিনেক চেম্বারে ঢুকল। ফাইল হাতে, মুখে কিন্তু হাসির আভাস। চেম্বারের এপারেও ভেসে এলো হাসির হাল্‌কা শব্দ। মিঃ ঘোষালের চাপা গলার আওয়াজ। অফিসের নীরস ফাইলেও হাসাহাসি করার এত কি পেল দুজনে। তা তো নয়, ফাইলটা ভিতরে যাবার পাসপোর্ট, এ-পার আর ও-পারের মাঝখানে নড়বড়ে সেতু।

বীণা বাগচী যতবার চেম্বার থেকে বাইবে এলো, সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দুটি গালে যেন লালচে আভা, খুশী-ঝলমল মুখেব চেহারা, বাঁকানো ঠোঁটের ভাঁজে বিজয়িনীব হাসির ছোপ। হয়ত ভুল দেখলাম। নিজের ঈর্ষা-নীল দৃষ্টিতে সঠিক দেখাও সম্ভব নয়। মনের রঙের ছোঁয়ায় সব কিছু একাকার। চোখের জলে সব দিক ঝাপসা। নিজের মন দিয়ে সযত্নে ভূত গড়লাম, ভয় পেলাম তাবই বিকট মূর্তি দেখে।

আমি হাতঘড়ির দিকে আলতো নজর বোলাতেই অমিতা দেবী থেমে গেলেন, ও, আপনার বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে, না?

না, দেরী আর কি?—আমতা আমতা করলাম। গল্পের শেষটা প্রায় জানা হয়ে এসেছে তাই উৎসাহের দীপও নিবু নিবু।

আচ্ছা, আমি একটু তাড়াতাড়ি বলছি এবারে। সত্যি এতক্ষণ যেন বড় ঢিমে তেতালায় চলেছিলাম। আসল কারণ কি জানেন, বান্ধবীর কাহিনী কিনা, কিছু বাদ দিতে ভয় হয়।

কোন উত্তর দিলাম না। চেয়ারের হাতলে দুটো হাত প্রসারিত করে চেপে বসলাম।

লেখক মানুষ আপনারা, বাকিটা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন ?—অমিতা দেবী সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

লেখক না হলেও, আন্দাজ করা খুব শক্ত নয়। মিঃ ঘোষাল আর বীণা বাগচীর মিলন হ'ল, আপনার বন্ধু বাদ, এই তো ?

ঠিক তাই, কিছুদিন পরে সুলেখাকে মানে আমাকে মিঃ ঘোষাল ডেকে পাঠালেন। সিমলা সফর। অফিসেরই জরুরী কাজে। ছোট সাহেব শ্রীনিবাসম্ যাচ্ছেন, সঙ্গে আর্দালী আর স্টেনো। বাড়তি কেরানী হিসাবে আমি। গেলে অবশ্য আমারই লাভ। ভাতা হিসাবে পাওনাটাও নিন্দার নয়। মধ্য-বিত্ত-সংসারে উপরি-আয় রক্তের সামিল। প্রায় মাস দেড়েক। মিঃ ঘোষাল বোঝালেন, তুমি আর ইতস্ততঃ ক'রো না। নতুন জায়গা দেখাও হবে, উপরি রোজগারও। অফিসে আরও জন তিনেক ইতিমধ্যে দেখা করে গেছে, কিন্তু তুমি যদি রাজি থাক, তা হলে আর কাকেও পাঠাব না।

এমনি দেড় মাস হয়ত এমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু মনের মানুষকে ছেড়ে থাকার পক্ষে অনেকটা সময়। কিন্তু তবু রাজী হয়ে গেলাম। বিয়ের সময় হাতেও তো কিছু থাকা দরকার।

বোধ হয় পৌঁছবার পরের দিন সাতেক কি বড় জোর দিন দশেকের মধ্যেই চিঠি পেলাম। মিঃ ঘোষালের নয়, রমা মজুমদারের লেখা। দু লাইন চিঠি, কিন্তু মানুষের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়তে দু ইঞ্চি ছুরির ফলাই যথেষ্ট। দু হাতে কপাল চেপে বসে পড়লাম। সিমলার কনকনে হাওয়াতেও যেন আগুনের

প্রবাহ। দু বার চাকরি ছাড়ার দরখাস্ত লিখে দুবার ছিঁড়লাম। অভিমানের পাশাপাশি ক্ষুধাতুর মুখের সার। মা-বাপের সঙ্গে এক লাইনে অপোগণ্ড ভাইদুটোর মুখ। বিয়ে একটা বিলাসিতা মধ্যবিত্তের পক্ষে, তাছাড়া অ-সম বিয়ের তো কথাই নেই। চাঁদের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে বাবলা কাঁটায় হাত ছ'ড়ে একাকার। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগলো মিঃ ঘোষালের ছলনা, ছুতো করে আমাকে সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা।

মন ঠিক করতে দিন পনেরো লাগলো। ফেলে আসা হাসি, কথার টুকরো, মান অভিমানের ছোট ছোট ছবি আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো। মন দিয়ে চা'করী শুরু করলাম। প্রায় কোমর বেঁধে। ওপরওলাদের ধরাধরি ক'রে দিল্লীতে বদলি হলাম। কলকাতায় ফিরতে আর মন চাইলো না। বীণা বাগচীর সংসারে আমার গিয়ে দাঁড়ানোর কোন মানে হয় না।

দশটা বছর একটা মেয়ের জীবনে বড় কম নয়, বিশেষ ক'রে চাকরী-জীবনে। তার আর আলাদা কোন সত্ত্বা থাকে না, নারীর কোমল বৃত্তি তো নয়ই। সায়েবের মন যোগানো খেলায়, সহকর্মীর ভুল ত্রুটি ধরতে, পাঁচ টাকা ইনক্রিমেণ্টের জন্য পাঁচশো বকুনী হজমের ব্যাপারে অতিমাত্রায় পটু হয়ে ওঠে। অফিসের পরিধি ছাড়িয়ে দূরের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে আসে।

অমিতা দেবী এখানে একটু থামলেন। মুখে হাত রেখে হাই তুললেন। চৌকো রুমালে দেহের শ্রান্তি মুছতে মুছতে বললেন, বাপের অসুখের খবর পেয়ে চলে আসতে হ'লো। আড়াই

মাসের ছুটি। বাপকে রাখতে পারলাম না। টলমলে সংসারের দিকে চেয়ে ফিরে যেতেও মন সরলো না। বড় ভাইটি আমার পাঠানো টাকা সম্বল ক'রেই বিয়ে ক'রে বসেছে। প্রায় বছর পাঁচেক। তিনটি ছেলে। নিজে কোন সাইকেল সারানোর দোকানে ঘণ্টা চারেক হাজিরা দেয়। যা পায়, তাতে নিজেদের ডালভাতও চুলোয় যাক, ছেলেদের দুধও জোটে না। এ সব দেখে আর দিল্লী ফিরে যেতে ইচ্ছা করলো না। আবার ধরাধরি ক'রে এখানেই রয়ে গেলাম।

বাইরে বেশ অন্ধকার। রিক্সার ঠুং ঠাং শব্দ, পথ চলতি মানুষের জুতোর আওয়াজ। রাত সাড়ে আটটা। ওঠার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতা দেবীর গলা, এতদিন পরে কাল দেখা হ'য়ে গেলো। বেশ বুড়ো হ'য়ে গেছেন। কপালে হিজিবিজি আঁচড়। বয়সের নয়, দুশ্চিন্তার। আমাকে দেখতে পেয়ে রাস্তা পার হ'য়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন পুরো সময়ের আগেই। অনেকক্ষণ কথা হ'লো। পুরোনো দিনের রঙের ছোপ-লাগা হালকা হাওয়া নয়, জীবনের কথা, সমস্যার কথা। সব শুনলাম। বীণা বাগচীকে আশ্চর্য লাগলো। দুটি ছেলের মা, ভরা সংসারের গিন্নী, অথচ পিণ্টোর সঙ্গে ঘর ছাড়লো। মিঃ অগষ্টিন পিণ্টো, বেহালা শেখাবার জন্যে যাকে রাখা হয়েছিলো। এই ব্যাপারের পরেই মিঃ ঘোষাল অবসর নিয়েছিলেন। চারদিকে জানাজানি হ'য়ে গেছে। মুখ তুলে কারুর দিকে চাইবার উপায় নেই।

শরীরে আর মনে যৌবনের ছিটেফোঁটাও নেই, হালকা কথা শুনলেও এখন গা ঘিন ঘিন করে, তবু ভালো লাগলো। মিঃ ঘোষালের ক্লান্ত গলার স্বর, পড়ন্ত বেলার রঙের ঝিলিমিলি। রাজী হলাম। ভেঙে-পড়া সংসারের ভার, সেই সঙ্গে ওঁরও।

সে কি?—গলাটা একটু জোর হ'য়ে গিয়ে থাকবে। ব্যাপারটা সত্যিই মনে ধাক্কা দেবার মতনই। একজনের ফেলে যাওয়া অগোছালো সংসারের সুতোর জট ছাড়ানোর ভার। সেই সঙ্গে পুরোনো মনের মানুষটারও!

অমিতা দেবী উঠে দাঁড়ালেন, হেসে বললেন, অবশ্য গল্পটা আপনি যে ভাবে ইচ্ছা শেষ করতে পারেন, আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু সুলেখার জীবনের পরিণতি বিয়োগান্ত নয়। সে মিঃ ঘোষালকে কথা দিয়ে এসেছে।

অমিতা দেবী উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমিও উঠে দাঁড়ালাম। শেষটা একটু নাটকীয়। গল্প লিখলে হয়তো সমালোচকরা এই কথাই বলবেন। এ নিয়ে আদৌ গল্প লেখা চলে কি না জানি না, কিন্তু অমিতা দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলার ইচ্ছা হ'লো না। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালাম, পিছনে পিছনে অমিতা দেবীও এলেন। অন্ধকার, তবে ঠাওর ক'রে চলা যায়। এমন কিছু অসুবিধা নয়।

অমিতা দেবী খুব আস্তে বললেন—প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে, বাতিটা ফিউজ হ'য়ে গেছে, পথ চিনতে অসুবিধা হবে না তো?

ঘুরে দাঁড়ালাম। চকচকে ছুটি চোখ। জ্বলন্ত ততটা নয়,

যতটা করুণা-মেদুর। হেসে বললাম, পথ চিনতে হয়তো একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু বিশ্বাস করুন মানুষ চিনতে একটুও অসুবিধা হয় নি।

ফাঁকি

সারাটা দিন অনীতাকে একটু নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় দিলো না। কেউ না কেউ ঠিক রইলো সঙ্গে।

ঘুম ভাঙতেই ঠাকুমার গলার আওয়াজ অনীতার কানে গেলো।

'না, কোন দরকার নেই তোমার সাতসকালে উঠে ফুল তুলতে যাবার। বনে বাদাড়ে ঘুরতে হবে না ভোর থেকে। আজ গীতু ফুল এনে দেবে 'খন।'

'গীতু ছেলেমানুষ ঠাকুমা, ও কি পারবে? তার চেয়ে আমিই যাই। যাবো আর আসবো। ঘোষালদের বাগান আর কতটুকু।' অনীতা অনুযোগ করলো। কদিন থেকে ঘোষালদের বাগানে তার মনটা পড়ে রয়েছে। এতদিনে নিশ্চয় পেকে লাল টুকটুকে হয়ে গেছে করমচাগুলো। ভোরের দিকে ফুল তুলবার অছিলায় কোঁচড় ভর্তি করে নিয়ে আসার খুব সুবিধা। তারপর স্নান আর

মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে চেখে চেখে খাওয়া সারাদিন ধরে। টক টক মিষ্টি মিষ্টি অপূর্ব একটা আস্বাদ।

বিছানা ছেড়ে উঠবার মুখেই ঠাকুমার গলার ঝংকারে অনীতা আবার ঝপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

'ওঃ ছেলেমানুষ! দশ বছরের ধাড়ি আবার ছেলেমানুষ কিসের লা? অমন বয়সে কবে আমরা বিয়ে থা ক'রে ঘর সংসার করেছি। সাত-আটজনের ভাতের হাঁড়ি নামিয়েছি এক-হাতে। চৌদ্দ বছর বয়সে তোর বাবাই পেটে এসেছিলো। দশ বছরের মেয়ে কচি খুকী নাকি?'

অনীতা কানের ওপর বালিশটা টেনে দিলো। কিন্তু তবুও ঠাকুমার গলা বেশ কানে আসতে লাগলো। শ্বশুরবাড়ীর ছোটো-খাটো ঘটনাগুলোর ওপর-রং ফলিয়ে, সেকালের মেয়েদের নিষ্ঠা আর কর্মপটুত্বের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুমা ব'লে গেলেন। তুলনা করলেন আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে। গালে মুখে রংমাখা এইসব পটের বিবিরা যে কেবল অকাজের ঢিপি এ কথা প্রতিপন্ন করতে তাঁর মোটেই সময় লাগলো না।

বালিশটা কানে চেপে অনীতা চোখ বুজলো।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে উঠতেই মার সঙ্গে অনীতার দেখা হ'য়ে গেলো।

'নীতা, আজ আর পাড়ায় টহল দিতে বেরিও না যেন। সেলাইটেলাই কিছু একটা নিয়ে ঘরেই বসে থাকো।' কথাটা

বলেই অনীতার মা কি একটা ভেবে নিলেন, তারপরেই ফিরে এসে অনীতার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না বাপু থাক, সেলাই ফোঁড়াই আজ আর কিছুই করতে হবে না তোমাকে। হাতে ছুঁচ টুঁচ ফুটিয়ে আবার একটা কাণ্ড করে বসবে, তার চেয়ে বইটই কিছু একটা নিয়ে বসে থাকো চুপচাপ। নয়তো গীতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে একটু পড়াবার চেষ্টা করো।'

শুধু ব'লেই অনীতার মা ক্ষান্ত হলেন না। বই খাতা দিয়ে গীতাকে ধরে এনে অনীতার জিম্মা ক'রে দিয়ে গেলেন।

'পড়বে এসো গীতা', অনীতা গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো। গীতা বই আর খাতা নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে দিদির গা ঘেঁষে বসলো। কিন্তু খোলা বইয়ের দিকে না চেয়ে, বড়ো বড়ো চোখ মেলে দিদির দিকে চেয়ে রইলো।

'আমার মুখের দিকে দেখছো কি হাঁ করে ?' অনীতা আরও গম্ভীর হওয়ার ভান করলো।

তার এই চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য কিন্তু গীতার কাছে ধরা পড়ে গেলো। দিদির গা ঘেঁষে ব'সে গীতা জিজ্ঞাসা করলো, 'আজ কোন্ কাপড়টা পরবে দিদি ?'

অনীতা এবার সত্যিই চটে উঠলো, 'এর নাম তোমার পড়া ? দিন দিন এক নম্বরের ফাজিল হ'য়ে উঠছো তুমি গীতা। দাঁড়াও বলছি মাকে গিয়ে।'

অনীতা ওঠবার চেষ্টা করতেই তার শাড়ীর আঁচলটা গীতা চেপে ধরলো, 'বারে, লতুদি যে বললে কালকে !'

'কি বললে লতুদি?' ভুরুদুটো কুঁচকে অনীতা জিজ্ঞাসা ক'রলো।

আড়চোখে গীতা দিদির দিকে একবার চেয়ে নিলো। একটু যেন সাহস পেলো মনে। মনে হ'লো কোঁচকানো ভুরু আর ওল্টানো ঠোঁটের পিছনে চাপা হাসির আভাস। দুটি চোখে খুশীর ঝলক। গীতা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'লতুদি বললো যে আজ তোমাকে দেখতে আসবে কোথা থেকে?'

'লতুদির মাথা।' ঠোঁটদুটো কামড়ে অনীতা উত্তর দিলো, 'নাও বাজে কথা রেখে তুমি পড়তে আরম্ভ করো তো।'

দিদির কথার ধার দিয়েও গীতা গেলো না। একটা হাত দিদির কোলের ওপর রেখে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, পছন্দ হ'লেই তো তোমায় নিয়ে যাবে, তুমি চলে যাবে এখান থেকে, না?'

ধমক দিতে গিয়ে অনীতা থেমে গেলো। গীতার দুটি চোখ চকচক করছে জলে। অনীতা একটু আনমনা হ'য়ে পড়লো। ওর বাবা যখন মারা যান, গীতা তখন মাস ছয়েকের মেয়ে। ওর নিজেরই বা তখন কি আর বয়স। দুটিতে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছে—সুখে দুঃখে, মধ্যবিত্ত জীবনের হাসিকান্নার মধ্য দিয়ে। ওদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে মাঝে মাঝে মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন। অনীতা কিছুটা বুঝতো, কিন্তু গীতা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকতো মার দিকে। বয়সের চেয়েও গীতা অনেক বেশী সরল। কেউ ছেড়ে যাবে শুনলে, আজও চমকে ওঠে।

হাত দিয়ে অনীতা গীতাকে কাছে টেনে এনে বললো, 'আমি যদি চলে যাই, তোর বড্ড কষ্ট হবে গীতু না ?'

দিদির হাতটা তুলে নিয়ে গীতা নিজের গালে আর চোখের ওপর আলতোভাবে ছোঁয়ালো, আস্তে আস্তে বললো, 'তুমি চলে গেলে, ভালো লাগবে না দিদি।'

অনীতা কোন উত্তর দিলো না। গীতাকে জড়িয়ে ধরে চুপ-চাপ বসে রইলো।

মার পায়ের আওয়াজ কানে যেতেই গীতা তাড়াতাড়ি সরে বসলো। শাড়ী গুছিয়ে নিয়ে অনীতা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

রেকাবীতে তালের বড়া নিয়ে মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'নীতা, সকাল থেকে তো কিছু মুখে দিস নি, নে এই বড়া কখানা খেয়ে নে।'

অন্যদিন অবশ্য এমন সময়ে কিছুই মুখে যায় না অনীতার, কিন্তু আজ যেন সব কিছু বদলে গেছে। ভোরের দিকে ঠাকুমা ভাঁড়ার ঘরের শিকল খুলে অনীতাকে ডেকেছিলেন হাতছানি দিয়ে। কি জানি, চেঁচিয়ে ডাকলে যদি গীতাও এসে জোটে। তাকের ওপর থেকে মাটির ভাঁড় নামিয়ে অনীতার হাতে তুটো নারকোলের নাড়ু তুলে দিয়েছিলেন, 'এইখানে বসে খা মা। বাইরে যাস্ নি। এখনি গীতা দেখতে পেলে চিলের মতন ছো মেরে এসে পড়বে। মুখুজ্জে গিন্নী কাল বিকেলে চারটে নাড়ু দিয়েছিলেন, আঁচলে বেঁধে এনেছিলুম। কাল রাত্তিরে তুটো

খেয়ে জল খেয়েছিলুম, আর এই দুটো তুলে রেখে দিয়েছিলুম তোর জন্য।'

অনীতাকে কাছে বসিয়ে জোর ক'রে নাড়ু দুটো ঠাকুমা খাইয়েছিলেন। কাপড় দিয়ে অনীতার মুখটা মোছাতে মোছাতে ধরা-গলায় বলেছিলেন, 'আহা বাপ যার নেই, পিথিমিতে তার কেউই নেই। আজ বাপ বেঁচে থাকলে কি আর তোদের মতন সোনার পিতিমেদের বিয়ে আটকায়। টাকার জোর থাকলে কত বড় বাড়ীতে পড়তিস্ তোরা।'

ঠাকুমার চোখে জল দেখে অনীতার চোখদুটোও ছল-ছলিয়ে এসেছিলো। এতদিন বিয়ে আটকে থাকার দুঃখে নয়, ঠাকুমার কথা বলার ধরণে।

মার হাত থেকে রেকাবীটা নিতে নিতে অনীতা বললো, 'সকালে ঠাকুমা দুটো নারকেলের নাড়ু দিয়েছে মা। এতগুলো বড়া এখন খেতে পারবো না।'

'তা হোক, খা। কত ভালোমন্দ জিনিস যেন খাচ্ছিস্ দুটিবেলা। যেমন বরাত ক'রে এসেছিলি মা।' যাবার সময় অনীতার মা গীতাকে ডেকে নিয়ে গেলেন, 'গীতা রান্নাঘরে আয়।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মার পিছন পিছন গীতা চলতে শুরু করলো। রেকাবীটা নিয়ে অনীতা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

কাঁঠালীচাঁপার ঝোপের ওপরে এক চিলতে রোদ এসে

পড়েছে। পাতাগুলো চিক চিক করছে। বাতাসে দুলছে সরু সরু ডালগুলো। কালভৈরবের মন্দিরের চূড়োর ত্রিশূলটা তালবনের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। জারুলগাছের পাশে কানায় কানায় দীঘির জল টলটল করছে।

অনেকক্ষণ ধরে অনীতা চেয়ে চেয়ে দেখলো। বুকটা টলমল ক'রে উঠলো। এইসব ছেড়ে হয়ত একদিন চলে যেতে হবে! গাছপালার মিষ্টি ছায়া আর মাটির সোঁদা গন্ধ পিছনে রেখে অনেক দূরের শহরে গিয়ে উঠতে হবে! পাঁজর বের করা পোড়োবাড়ীটার মায়াই কম নাকি! চুনবালির আস্তরণের মতন অনীতাও যেন লেপটে রয়েছে বাড়ীর খাঁজে খাঁজে। উঠানের মাটির ফাটলের মধ্যেও ও যেন ছড়িয়ে গেছে।

'রোদ্দুর থেকে সরে এসো অনীতা', কাকার গলার আওয়াজে অনীতা চমকে সরে দাঁড়ালো।

স্নান সেরে কাকা চুল আঁচড়াতে এসেছেন। খেয়ে দেয়ে একটু পরেই সাইকেলে চড়ে স্টেশনের দিকে রওনা হবেন। নিরীহ ভালমানুষ। অনীতার বাবা মারা যাবার পর বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরে ছিলেন সবাইকে! বাইরের রোদ জলের ঝাপটা কারুর গায়ে লাগতে দেন নি। সামান্য মাইনের চাকরি কিন্তু মাসের প্রথমে সব কটা টাকাই তুলে দিতেন অনীতার মায়ের হাতে।

এদিক ওদিক থেকে কত সম্বন্ধ এসেছে বিয়ের কিন্তু কাকার উচ্চহাসির চোটে সব প্রস্তাব ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছে,

'অনীতার বিয়ে হোক, তারপর আমার বিয়ের কথা ভাববো। ধিংগি মেয়েটাকে পার করি আগে।'

চুল আঁচড়ে কাকা চলে গেলেন ঘর থেকে।

জানলা থেকে সরে ঘরের কোণে অনীতা বসে পড়লো। হাঁটুর ওপর থুঁতনীটা রেখে চেয়ে রইলো দেয়ালের দিকে।

আজ এই প্রথম নয় তবু যেন বুকের ভেতরটা কেমন গুর গুর ক'রে উঠলো, শুকিয়ে আসতে লাগলো দুটো ঠোঁট। কিন্তু এবারে ঠিক আগের মতন দেখতে আসা নয়। আগের দুবার পাত্রের বাবা আর মামা এসেছিলেন দেখতে। একজন হাত টেনে নিয়ে কররেখা বিচার করেছিলেন, পকেট থেকে অতসী কাঁচ বের ক'রে পায়ের আঙ্গুলগুলো টিপে টিপে দেখেছিলেন। গণ, কুষ্ঠি, জন্মের তিথি নক্ষত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে পরে খবর দেবেন ব'লে চলে গিয়েছিলেন।

আর একবার পাত্রের এক মামা এসেছিলেন দেখতে। তাঁর গোঁফজোড়াটার কথা ভাবলে এখনও মাঝরাতে অনীতা চমকে ওঠে। তেমনি গম্ভীর গলার আওয়াজ। অনীতার চুল টেনে, জল দিয়ে ঘষে ঘষে হাতের রং পরখ করে, তাকে হাঁটিয়ে বসিয়ে দাঁড় করিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। তারপর দেনাপাওনার কথা উঠতেই এক হাতে পাকানো গোঁফজোড়া আরও ছুঁচালো করতে করতে যা ফিরিস্তি দিয়েছিলেন, তাতে অনীতার কাকার দমবন্ধ হ'য়ে যাবার যোগাড় হ'য়েছিলো।

এবার কিন্তু সে সব কিছু নয়। পাত্র নিজে আসছে দেখতে।

লজ্জায় অবশ্য একথা পাত্র জানায় নি। বলেছে, পাত্রের দুজন বন্ধু আসবে দেখতে, কিন্তু কানাঘুষায় ঠিক খবর এসে পৌঁচেছে যে পাত্র নিজেই আসছে বন্ধু সেজে।

সহরের কলেজে পড়া ছেলে। রুচি আলাদা পছন্দও আলাদা। অনীতার মাসীর জানা ছেলে। মধ্যবিত্ত ঘর হলেও ছড়ানো ছিটোনো জমি জমা কিছু আছে, মাথা গোঁজবার আস্তানাও আছে একটা। মেয়ের খাওয়া-পরার অভাব থাকবে না। এখন অনীতার বরাত।

অনীতা কিন্তু ভারি মুস্কিলে পড়ে গেলো। বুড়োদের সামনে বসে চোখ কান বুজে তাদের পছন্দের নির্যাতন সহ্য করা এক-রকম তবু গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কলেজে-পড়া ছেলেদের ধরণধারণ সম্বন্ধে কিছুই ওর জানা নেই। কি জানি কি প্রশ্ন করে বসবে, গাইতে বলবে নাকি অঙ্কই জিজ্ঞাসা করে বসবে শক্ত শক্ত। অনীতার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠলো।

গামছা হাতে ঝুলিয়ে দরজার গোড়ায় অনীতার মা এসে দাঁড়ালেন 'চলো নীতা, তাড়াতাড়ি চান করে নেবে। আজ আর বেলা করে লাভ নেই।'

অন্যদিন খিড়কীর পুকুরে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে অনীতা জল তোলপাড় করে তুলতো। ঘাটের চাতালে বসে সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে নানান গল্প, পালেদের কালা মেজ বৌয়ের সঙ্গে হাসিমস্করা, সোজা কথার বাঁকানো বাঁকানো উত্তর দেওয়া, তার

পর সবাই মিলে পুকুরের জল ঘোলাটে করে তুলতো। ঘণ্টা দেড়েকের আগে অনীতার কোনদিনই সারা হতো না।

'তুমি চান করে এসো মা, আমি একটু পরে যাবো,' অনীতা একবার শেষ চেষ্টা করলো।

'না মা, আজ আর দলবল নিয়ে ঝাঁপাই জুড়ে তোমার কাজ নেই। তাড়াতাড়ি চান সেরে, খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেবে আজকে। চারটে সাড়ে চারটের মধ্যেই ওরা দেখতে আসবে।'

অনীতা বুঝলো, ছককাটা জীবনযাত্রার আজ আর একটু এদিক ওদিক হবে না। ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ, বের হলেও মায়ের চোখে চোখে থাকতে হবে। তারপর বিকেল তিনটে বাজতেই সবাই ওকে নিয়ে পড়বে। মাজাঘষা শুরু হবে, নানা ঢংয়ে চুল বাঁধা, কাঁচপোকা আর কুঙ্কুম কিসের টিপ দেওয়া হবে তাই নিয়ে প্রচুর কথাকাটাকাটি হবে বেশবিন্যাসকারিণীদের মধ্যে। তারপর যাত্রার সং সেজে ঘাড় হেঁট করে বসে থাকতে হবে ঘণ্টাখানেক। নানা আকৃতির পায়ের ধুলো সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকাবার ভাণ করতে হবে। ইতিমধ্যে পাড়ার অন্য মেয়েদের বোনা রাশীকৃত কার্পেটের আসন আর সেলাইয়ের কাজগুলো অনীতার কাকা অভ্যাগতদের দেখাবেন নিজের ভাইঝির সীবন-পটুত্বের নমুনা হিসেবে। বিনিয়ে বিনিয়ে বললেন, অনীতার অসাধারণ কর্মকুশলতার কথা, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় না ভুগলে স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্যে অনীতা কি স্তরে উন্নীত হতো তার একটা হদিশ দেবেন। মোট কথা, এ রকম ধীর, স্থির, নম্র,

সর্বগুণসম্পন্না মেয়ে আশেপাশের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে আছে কিনা, অনেক ভুরু কুঁচকেও অনীতার কাকা তা যেন ঠিক করে উঠতে পারবেন না। পাড়ার দু একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যাঁদের সঙ্গে কালেভদ্রে অনীতার দেখা হয় এবং যাঁরা মাঝে মাঝে অনীতার কাকার কাছে অনীতার ধিংগিপনার সবিস্তার বর্ণনা দেন, তাঁরাও গম্ভীর হয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'মা আমাদের সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। মায়ের যেমন শ্রী, তেমনি গুণ। আর কি চমৎকার রান্না মায়ের হাতের।'

হাসি চাপতে গিয়ে অনীতা শাড়ীর আঁচলটা হেঁট হয়ে মুখে পুরে দেবে আর মনে মনে ভাববে কখন সমাপ্তি হবে এই প্রহসনের!

মায়ের গলার আওয়াজে অনীতা চমকে উঠে দাঁড়ালো, 'নে ওঠ, বেলা হয়ে গেছে এমনিতেই।'

মায়ের পিছন পিছন অনীতা ঘাটে এসে দাঁড়ালো। ঘাট প্রায় ফাঁকা। সাবানদানি থেকে সাবান বের করে অনীতার মা বললেন, 'নে পিঠটা খুলে ঘুরে বোস। সাবান মাখিয়ে দিই। এসব পাট তো চুকে গেছে। বড়ো হয়েছিস, এখন নিজেও তো নিজের শরীরের একটু যত্ন করতে পারিস না। দেখছিস তো আমার অবস্থা। সংসারের কাজ করে একটু কি সময় পাই?'

কোন কথা না বলে পিঠের কাপড় খুলে অনীতা চুপ করে চাতালে বসে পড়লো। মায়ের কথা অনেকক্ষণ ধরে চলবে, তা ও ভালোই জানে। সাবানের টুকরো নিয়ে অনীতা নিজেই মুখ

ঘষতে লাগলো।

'কে অনীর মা নাকি? কি ব্যাপার, মেয়েকে পরিষ্কার করতে নিজেই লেগে গেছো যে?'

চোখে মুখে সাবানের ফেনা থাকায় অনীতা চোখ চাইতে পারলো না, কিন্তু বুঝতে পারলো রায়েদের ছোট বৌ চান করতে এসেছেন। চোখ বন্ধ করেই অনীতা রূপটা কল্পনা করে নিলো। লাল গামছা ভাঁজ করা ডানহাতের ওপর। রূপোর সাবানকেস, জিভছোলা, হাতে জবাকুসুমের শিশি। ঠোঁটটা সর্বদাই বাঁকানো, সেইজন্যই বোধ হয় সোজা কথাগুলোও বাঁকা হয়ে বের হয়।

'আর বলেন কেন মাসীমা,' খুব নিস্তেজ অনীতার মার গলার আওয়াজ, 'বয়স হচ্ছে কোথায় একটু ফিটফাট থাকবে, তা নয় হৈ হৈ করে বেড়িয়ে মেয়ের মূর্তি হয়েছে দেখুন না?'

একটা আওয়াজে অনীতা বুঝতে পারলো, রায়েদের ছোট বৌ সিঁড়ির চাতালে জুতসই হয়ে বসলেন।

'তোমার মেয়ের রং তো বাছা ময়লা নয় তবে নাকমুখের বাহার তেমন নেই। আমাদের পদ্মকে দেখেছো, হ্যাঁ অনীর মা, আমার সেজ ভাইয়ের মেয়ে? দিনকতক আমার কাছে এসে ছিলো সে মাস কয়েক আগে।'

উত্তরে অনীতার মা কি ভাবে ঘাড় নাড়লেন অনীতার বুঝবার উপায় ছিলো না। ধুঁধুলের ছোবড়া দিয়ে আলতোভাবে তখন গালের পরিচর্যা চলেছে। ছোট বৌয়ের গলার আওয়াজ আবার শোনা গেলো, 'পদ্মর গেলো অঘ্রাণে বিয়ে হয়ে গেছে।

ছেলে কোথাকার জমিদার বুঝি। আহা কি চেহারা, দুটিতে এমন মানিয়েছে।' কিছুক্ষণ বিহ্বল থেকে আচমকা গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার অনীর বিয়ের কিছু ঠিক হলো ?'

'এখন কিছুই হয় নি মাসীমা। আজ আবার একদল দেখতে আসবে। দেখি আমার বরাত। সবই তো জানেন, তেমন দিতে থুতে তো পারবো না, মেয়েও আমার এমন কিছু অপ্সরী নয়, তবে কেউ যদি দয়া করে গরীবের মেয়েকে ঘরে তোলে।'

'ওই খাঁটি কথা বলেছ অনীর মা। দেবার থুবার ক্ষমতা না থাকলে, মেয়ে পার করাই মুস্কিল। যেমন চিনি ঢালবে, তেমনি মিষ্টি হবে। আমার সেজ ভাই এতোটি ঢেলেছিলো, তাই না অমন সোনার জামাই পেয়েছে।'

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে অনীতা অনেকটা সরিয়ে ফেললো ফেনার রাশ। আঁচলের খুঁট দিয়ে কানের পাশগুলো রগড়াতে লাগলো।

'তা কোথা থেকে আসছে দেখতে ?'

'রাইগঞ্জ থেকে। আমার ছোট বোন থাকে ওখানে, সে-ই সম্বন্ধ ঠিক করেছে।'

'পাত্র করে কি ?'

'আই-এ পড়ছে বুঝি। বাপ মা কেউ নেই। মামার বাড়ীতে মানুষ। ছেলেটি নাকি ভারি ভালো।' অনীতার মার কথার ঢংয়ে মনে হলো, এ প্রসঙ্গ থামলেই যেন তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মাথার ওপর কেউ নেই। ছেলে সম্বন্ধে ভালো ক'রে খোঁজ-খবর নিও। আমার বাপু কেমন কেমন ঠেকছে।' হাতের চেটোয় জবাকুসুম ঢেলে ব্রহ্মতালুতে ছোটবৌ চাপড়াতে লাগলেন। সংসারের নানান ঝঞ্ঝাটে গোছা গোছা চুল উঠতে আরম্ভ হয়েছে।

'কি জানি মাসীমা, ঠাকুরপো তো খোঁজখবর নিয়েছে অনেক। আবার নন্তর সঙ্গে নাকি পড়ে। সেও বলছিলো ছেলেটি নাকি ভালো।' অনীতার মা মেয়েকে নিয়ে পুকুরের দিকে নামতে নামতে বললেন।

'কোন্ নন্ত?'

'ওই যে ঘোষালদের মেজ শরিকের ছেলে।' এতক্ষণে অনীতার মা গলা জলে নেমে পড়েছেন। গামছা ডুবিয়ে মাথায় জল দিতে দিতে বললেন, 'আর আগে পছন্দই হোক, তারপর আমাদের খোঁজখবরের কথা। যেমন পোড়ার বরাত করে এসেছি মাসীমা। লোকের কপালে ধূলোমুঠো ধরতে সোনামুঠো হয়, আর আমার ঠিক উল্টো।'

'আজ দেখতে আসছে কে?' কথাগুলো একটু অস্পষ্ট শোনা গেলো। জিভছোলা নামিয়ে রেখে ছোট বৌ আবার বললেন কথাগুলো।

'পাত্র নিজেই আসবে,' অনীতার মা পর পর তিনটে ডুব দিয়ে উঠলেন। চোখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে থ' হয়ে গেলেন। গালে হাত দিয়ে চোখদুটো বড়ো বড়ো করে ছোট

বৌ বসে আছেন। বল্লেন, 'কালে কালে কতই দেখবো বাছা। শহরে এরকম হয় নাকি শুনেছি, কিন্তু আমাদের গাঁয়ে বাছা এমন খ্রেষ্টানী কাণ্ড শুনি নি। সাতচুলোয় কেউ না হয় নেই, তা'বলে পাত্র নিজে আসবে দেখতে, কি ঘেন্নার কথা মা!"

অনীতার মা অনীতাকে নিয়ে কোনরকমে পুকুর থেকে উঠে পড়লেন। অনীতার বিশ্রী লাগলো। সত্যিই তো বাপু, কি দরকার ছিলো পাত্রের আসবার। নিজের কেউ কোথাও না থাকে, দূরসম্পর্কের বুড়ো হাবড়া গোছের কাউকেই কি পাওয়া গেলো না,—গুরুজনস্থানীয় কোন লোক! তা হলে অনীতাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতো। কোনরকমে শাড়ী জড়িয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে অন্য দুবারের মতন গিয়ে বসলেই হতো। রান্নাবান্নার কথা, ঘর গেরোস্থলীর কথা, বড়ো জোর আঁকাবাঁকা অক্ষরে 'শ্রীমতি' দিয়ে শুরু করে নিজের নামটা কাগজের ওপর লেখা—বাস এই পর্যন্ত। তা নয়, অনীতা কি ফ্যাসাদেই পড়েছে!

মার ডাকে অনীতা ধড়মড় করে মাদুর ছেড়ে উঠে পড়লো।

'নীতা উঠে পড় মা। বেলা পড়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে নাও।' রান্নাঘর থেকে মা চেঁচালেন।

উঠে বসে অনীতা চোখ দুটো কচলাতে লাগলো। এইবার মুখ হাত ধুয়ে প্রসাধনের হাঙ্গামা শুরু হবে। মনে মনে বিরক্তই হয়ে উঠলো।

উঠে ঘাটের দিকে যেতেই মার ডাকে অনীতা আবার ফিরে দাঁড়ালো।

'কি মা?'

'ঘাটে গিয়ে কাজ নেই। ওদিকের দাওয়ায় গামছা, সাবান, জল সব রয়েছে। বেশ ক'রে মুখে ঘাড়ে সাবান দিয়ে নাও।'

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অনীতা টের পেলো বিকেলের অভ্যাগতদের জন্য মার আয়োজন চলেছে। নারকেলের ছাঁচ, তালের বড়া, আঁটা ছেঁকে নিয়ে হালুয়া—এর ওপরে কাকা আসবার সময় স্টেশন থেকে সত্য মোদকের দোকান থেকে সন্দেশ নিয়ে আসবেন—এসব অনীতার একরকম মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু গীতা গেলো কোথায়? এইসময় অন্যবারে রান্নাঘরে বসে মাকে সে সাহায্য করে। তৈরী খাবার তাকে চাখতেও হয়, হাজার হোক বাইরের ভদ্রলোকদের সামনে যা তা জিনিস তো আর দেওয়া যায় না।

যেতে যেতে অনীতা জিজ্ঞাসা করলো, 'গীতা কই মা, পাড়ায় বেরিয়েছে বুঝি?'

ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজেও অনীতার কথাটা কিছুটা মার কানে গেলো। সাবধানে কড়াটা নামিয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে বল্লেন—'আমায় কিছু বল্লি নীতা?'

'হ্যাঁ মা, গীতা কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম?'

'গীতা ঘোষেদের ছোট বৌকে ডাকতে গেছে।'

'ঘোষেদের ছোট বৌ কেন মা, রাধু পিসী আসবে না?'

মার দিক থেকে কোন উত্তর এলো না। ততক্ষণে তিনি আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। উনুন কামাই যাচ্ছে, বসে গল্প করবার কি আর সময় আছে!

কিন্তু সবই বুঝলো অনীতা। অন্যবারে সেকেলে ধরণের বুড়ো হাবড়া লোক আসে দেখতে, সুতরাং রাধু পিসীর পছন্দই যথেষ্ট। কোন রকমে টেনে চুলটা বেঁধে নিয়ে, কপালে গড়িয়ে আসা তেলটা মুছে সিঁদূরের টিপ একটা পরিয়ে দেওয়া পেবেকের মাথা দিয়ে। পায়ে আলতা আর পুরোনো রংচংএ শাড়ী জড়িয়ে দেওয়া। তারপর রাধু পিসী অনীতার চিবুকটা তুলে ধরে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ, তারপর বলতেন, 'দেখো দিকিনি, কি সুন্দর দেখাচ্ছে। এ মেয়েকে যে অপছন্দ করে যাবে, সে মিন্সের চোখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।'

এবার কিন্তু অন্য ব্যাপার, কাজেই রাধু পিসীর পছন্দের ওপর মা বিশেষ আস্থা রাখতে পারেন নি। ঘোষেদের ছোট বৌ হালফেরৎ ক'লকাতার মেয়ে। কি পোশাকে কাকে মানায়, আর কেমনটি চায় আজকালকার ছেলেরা, এ তার একেবারে নখদর্পণে।

মুখ ধুয়ে অনীতা ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই, গীতার গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, 'রাঙা কাকীমা এসেছেন মা।'

'কইরে অনী কোন্ ঘরে', রাঙা কাকীমার গলা শোনা গেলো। তারপরেই গীতাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

প্রসাধনের জিনিস তিনি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন।

ছাপানো শাড়ী আর ব্লাউজ, কি একটা ক্রীম আর ছোট বাক্সে সোনার ঝুম্‌কো।

'নে বস্‌, সময় আর নেই। এখনি এসে পড়বে। একটু না জিরিয়ে নিলে, তাড়াতাড়িতে ঘামে সমস্ত বিচ্ছিরি হ'য়ে যাবে।'

অনীতার হাতদুটো টেনে নিয়ে রাঙা কাকীমা ক্রীম মাখাতে শুরু করলেন। তারপর হাতে, ঘাড়ে, কানের পাশে খুব হালকা পাউডারের প্রলেপ দিলেন। চুল অনীতা নিজেই জড়িয়ে নিয়েছিলো, রাঙা কাকীমা খোঁপা খুলে দুপাশে লম্বা বিনুনী করে পিঠের দুদিকে ঝুলিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'কেন, খোঁপায় চুল লুকোতে যাবো কেন, আমাদের মেয়ের কি চুল কম নাকি। দেখুক না পাঁচজনে চুলের বহর।'

কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অনীতার মা মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছিলেন। একসময়ে বললেন, 'হ্যাঁলো, সিঁদূরের টিপ দিবি না?'

অনীতার মার কথায় রাঙা কাকীমা হেসে যেন লুটিয়ে পড়লেন। আঁচলটা মুখে চেপে বললেন, 'হ্যাঁ, সিঁদূরের টিপ দেবো কপালে, পায়ে মল দেবো, হাতে তাগা অনন্ত সব দেবো। তুমি বাপু যাওতো এখান থেকে। আমার শেষ হয়ে গেলে ডাকবো এখন, এসে দেখে যেও।'

অনীতার মা আর দাঁড়ালেন না। যেতে যেতে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি আর আসবো না এদিকে। তোমাদের মেয়েকে যেমন খুশি বাপু সাজাও।'

কপালে কাজলের সরু লম্বা টিপ এঁকে দেবার সঙ্গে সঙ্গে উঠানে পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। গীতা বাইরে গিয়ে খবর নিয়ে এলো, 'কাকা এসে গেছে।'

'কই হলো তোমাদের?' কাকা চৌকাঠ বরাবর এসে থেমে গেলেন, তারপর উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'ও বাবা, শহুরে বৌদি হাত লাগাতে আরম্ভ করেছো। ব্যস্ আর ভয় নেই।'

রাঙা কাকীমা মুচকি হাসলেন একটু, 'নেই-ই তো। অনী মুখটা তোলতো একবার।'

মুখ তুলেই অনীতা লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেললো। কেমন লজ্জা লজ্জা করলো। এর আগেও একরকম হয়েছে। বাড়ীর সবাইয়ের পছন্দ হয়েছে কিন্তু যারা দেখতে এসেছে তারা চলে গেছে মুখ ফিরিয়ে।

'কি হলো ঠাকুরপো, ওরা আসছে কখন?' হাতা হাতে করেই অনীতার মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'আজ সকালের গাড়ীতে পাত্র আর তার এক বন্ধু এসে উঠেছে নন্তুদের বাড়ীতে। রাস্তায় নন্তুর সঙ্গে দেখা হলো। বললে তো সাড়ে চারটের মধ্যেই এসে পড়বে।'

রাঙা কাকীমা এবারে অনীতার মার দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ দিদি, অনীর শাড়ীটা কি একটু কুঁচিয়ে পরিয়ে দেবো না মারাঠি প্যাটার্নের করে দেবো।'

'তুই আর ঢং করিস নি বাপু, ভালো লাগে না। জিজ্ঞাসা করার আর লোক পেলি না। আমি ওসব কতো বুঝি।' হুড়হুড়

করে অনীতার মা পালিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে পাড়ার আরো কয়েকটি মেয়ে এসে জুটেছিলো। তারা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

অনীর কাকা বললেন, 'বাঙালী প্যাটার্নেরই ক'রে দাও বৌদি। মারাঠি ধরণের শাড়ী পরে শেষকালে অনী হয়ত ওদের সঙ্গে মারাঠি ভাষায় কথা বলতে শুরু করবে। সর্বনাশ হবে।'

আবার হাসির হুল্লোড় উঠলো কিন্তু চললো না বেশীক্ষণ। জানলায় দাঁড়ানো মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই চুপ চুপ, ওরা এসে গিয়েছে। ওই যে তিনটে সাইকেল দেখা যাচ্ছে।'

হুড়মুড় করে সমস্ত মেয়ে জানলায় গিয়ে পড়লো।

তিনটিই ছোকরা। একটি পাড়ার নন্ত। তাকে সবাই চেনে। কাজেই উদ্বেগের কারণ হ'লো বাকি দুটিকে নিয়ে। একটি ছিপছিপে চেহারা, শ্যামবর্ণ। এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল। মুখশ্রী মন্দ নয়। তৃতীয়টি একটু চোয়াড়ে ধরণের—বয়সের চেয়েও যেন বেশী পাকা। কথাবার্তাও সেই অনুপাতে একটু মুরুব্বী ঘেঁষা।

রাঙা কাকীমাই প্রথম আবিষ্কার করলেন, 'ওই যে একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ময়লা ময়লা চেহারা, ওইটিই পাত্র, এই আমি বলে দিলুম। দেখছিস না কেমন ঘাড় নিচু ক'রে লক্ষ্মী ছেলেটির মতন বসে আছে, আর মাঝে মাঝে জানলার দিকে চোরা-চাউনী হানছে।'

অনীর মা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, 'ছেলেটিকে দিব্যি দেখতে। অনীর পাশে বেশ মানাবে। এখন মধুসূদন ভরসা।'

ঠাকুমা দাওয়ায় বসে ছিলেন। সমস্ত দিন পাড়ায় টহল দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বুড়ো মানুষ, বল্লেও তো শোনেন না। আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে জানলার দিকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন—তারপর বললেন, 'ও মেয়েরা, কোন্‌টি জামাই ?'

'ও মা, জামাই কি গো ? আগে পছন্দই হোক, তবে না।' রাঙা কাকীমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

অনীতার কাকা ভেতরে এসে দাঁড়াতেই মেয়েরা চুপ হয়ে গেলো।

'কই, অনী কোথায় ?'

এককোণে অনীতা চুপ করে বসে ছিলো। গীতা কাছে এসে দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়ালো।

বাইরের ঘরে ঢুকে আসনের ওপব গিয়ে বসে হাত জোড় করে নমস্কার করলো তিনজনকে। মুখ কিন্তু তুললো না।

'আপনার নামটা কি বলুন,' চোয়াড়ে ছেলেটির গলা।

'কুমারী অনীতা দেবী' অনীতার গলা কেঁপে উঠলো। এটা অবশ্য রাঙা কাকীমার শেখানো। নয়ত অন্যদিন হলে পুরো নামটাই সে বলতো—'শ্রীমতী অনীতাসুন্দরী দেবী।'

'পড়াশোনা কতদূর পর্যন্ত করেছেন।' এবারেও আগের গলা। আস্তে আস্তে অনীতা উত্তর দিলো। বিনিয়ে বিনিয়ে বললো কেন সম্ভব হয় নি বেশীদূর পড়া।

অনীতার মুখের কথা প্রায় লুফে নিয়ে অনীতার কাকা শুরু করলেন, 'ইস্কুলে বেশীদিন রাখতে পারি নি বটে, তবে বাড়ীতে অনেকদূর অবধি পড়েছে। বুঝতেই তো পারছেন মধ্যবিত্ত সংসার। ঘরকন্নার কাজ সবই ওকে দেখতে হয়, বৌদির শরীরও মোটে ভালো নয়। রান্নাবান্না ঝাঁটপাট সবই একহাতে ওকে করতে হয়।'

'গানটান আসে নাকি?' চোয়াড়ে ছেলেটি যেন নিঃশ্বাস ফেলতে দেবে না।

কিন্তু অনীতা উত্তর দেবার আগেই কোঁকড়ানোচুল ছেলেটি বাধা দিলো, 'মধু, ও জিজ্ঞাসা করে আর লাভ কি? গান জানা থাকলেও বিয়ের পরে গাইবার সুযোগ বড়ো একটা আসে না, বিশেষতঃ আমাদের মতন বাড়ীতে।'

গলার আওয়াজে অনীতা চমকে মুখ তুললো। সমস্ত শরীর যেন দুলে উঠলো। অনেকক্ষণ সে চোখ নামাতে পারলো না। প্রথমে আবছা কতকগুলো মূর্তি, তারপর ছেলেটির কোঁকড়ানো চুলের রাশ আর টানা দুটি চোখ দৃষ্টির সামনে যেন স্থির হয়ে গেলো। এ গলার আওয়াজ তো ভুলবার নয়।

পাশে জানালায় দাঁড়ানো মেয়েদের ফিসফিসানি কানে যেতেই অনীতা চোখ নামিয়ে নিলো। তারপরের কথাগুলো আর কানে গেলো না। একসময়ে গীতা হাত ধরে টানতে আস্তে আস্তে উঠে ঘরের মধ্যে চলে এলো।

'বাবা, ধন্যি মেয়ে বটে, অমনি ক'রে বাইরের লোকের দিকে

ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকতে হয়!' রাঙা কাকীমা কানের ঝুমকো দুটো খুলে দিতে দিতে বললেন।

'বেচারির মাথা ঘুরে গেছে। দেখলে না, মাথা নিচু ক'রে চুপটি করে বসে রইলো। আর একটি কথাও বললো না।' আর একটি মেয়ের গলা।

মুখে কিছু বললো না অনীতা কিন্তু বুকটা যেন তোলপাড় করে উঠলো। সরোজ আবার বাইরের লোক না কি? তাই যদি হতো তবে এই একবছরের মধ্যে কবে ধুয়ে মুছে অস্পষ্ট হয়ে যেতো ওর ছবি। মনের দিকে চোখ ফেরালে এমন জ্বলজ্বল করতো নাকি রংএ আর রেখায়!

সেদিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত বেশ মনে আছে অনীতার। ম্যালেরিয়ার পর শরীর সারাতে রাইগঞ্জে মাসীমার কাছে গিয়েছিলো মাসখানেকের জন্য। বাড়ীর পাশেই ছেলেদের খেলবার প্রকাণ্ড মাঠ। বিকেল হলেই ছেলের দল এসে জুটতো। সেই সময়টা ছাদ থেকে অনীতা নেমে আসতো। ওর মাসতুতো ভাই সাধনও খেলার পাণ্ডা ছিলো, তার মুখে সরোজের নাম দু-একবার অনীতা যে শোনে নি এমন নয়। খেলায় যে খুব নাম ছিলো সরোজের তা নয়, নাম ছিলো বাঁশের বাঁশিতে। খেলা থেমে গেলে, অন্ধকার নেমে এলে অনেকরাত পর্যন্ত একটা কান্নার আওয়াজ যেন ককিয়ে ককিয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তো।

প্রথম প্রথম অনীতা চমকে উঠেছিলো, 'কোথায় কে কাঁদছে

মাসীমা ?'

মাসীমা হেসেছিলেন, 'কাঁদবে কেন রে। ও, সরোজ বোধ হয় বাঁশী বাজাচ্ছে। ভারি সুন্দর বাজায়।'

কিন্তু একটা কথা কেবলি অনীতার মনে হয়েছে। অমন করুণ করে কেন বাঁশী বাজায়, আর তাছাড়া দিনের পর দিন একই কান্নার সুর। আর কোন সুর বুঝি আসে না ওর বাঁশীতে।

সরোজের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো চলে আসার দিন কয়েক আগে। একদিন মাসীমার সঙ্গে বসে অনীতা গল্প করছিলো, হঠাৎ দরজার গোড়ায় অনেকগুলো ছেলের হৈ চৈ আওয়াজে দুজনেই ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

সরোজকে কোলে করে ছেলেরা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছিলো। সরোজের পা-টা ভীষণভাবে মচকে গেছে, বেচারির দাঁড়াবার অবস্থা ছিলো না। সামনের ঘরের মাতুরের ওপরেই তাকে শোয়ানো হয়েছিলো। মাসীমা পাশে বসে পা-টা নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে দেখেই চমকে উঠেছিলেন। অনীতাও পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। বাঁ পা-টা ফুলে গোল হয়ে গিয়েছিলো—শুধু চমকে যাওয়া নয়, মনে হলো হয়ত হাড়ও সরে গিয়ে থাকবে।

ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন সাইকেল নিয়ে বরফ আনতে ছুটেছিলো। মাসীমা অনীতার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'অনী, উনুন থেকে ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে এখনি একটা খুরি করে চূণ

আর হলুদ গরম করতে দাও।' তারপর নিজের ছেলের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'দেখো তো সাধন, কাছাকাছি যদি কোথাও আকন্দ পাতা পাও।'

চুণহলুদ গরম করে আকন্দ পাতা দিয়ে মাসীমা সরোজের পা-টা বেঁধেছিলেন আর শিয়রের কাছে বসে হাতপাখা দিয়ে অনীতা একটানা বাতাস করে গিয়েছিলো। সারাক্ষণ যন্ত্রণায় সরোজ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো। ওব কান্নার সঙ্গে বাঁশীর সুরের কোথায় যেন মিল ছিলো। বাঁশীর সুরের মতন করেই ও যেন ব্যথাটাও ছড়িয়ে দিয়েছিলো চারদিকে, নয়ত সমস্তক্ষণ অনীতার বুকটাও যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠছিলো কেন অমন করে।

একবাব সরোজ আচমকা অনীতার একটা হাত আঁকড়ে ধরেছিলো, দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠেছিলো, 'উঃ, আর পাচ্ছি না, বড্ড কষ্ট হচ্ছে।' অনীতাও আর পারে নি, চোখ দিয়ে টপ টপ করে জলেব ধারা গড়িয়ে পড়েছিলো।

সেই রাত্রে সবোজের বাড়ীর লোকেরা গাড়ী নিয়ে এসে সরোজকে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আজও সরোজের কথা অনীতা ভুলতে পাবে নি। সরোজের চেহারা ওর ভুল হবার নয়।

অনেকক্ষন পরে যখন খেয়াল হলো অনীতার, তখন সবাই চলে গিয়েছে। মা চৌকাঠেব গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলছেন, 'নীতা, কাপড় চোপড় ছেড়ে কিছু খেয়ে নে মা। ঘরে হ্যারিকেনটা জ্বাল। অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।'

কাপড় চোপড় ছেড়ে হ্যারিকেন জ্বেলে অনীতা রান্নাঘরে গিয়ে বসতেই বাইরে নন্তুর গলা শোনা গেলো, 'মাসীমা, ও মাসীমা।'

অনীতার মাও যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বললেন, 'কে রে নন্তু, আয় বাবা, আয়। কি খবর ?'

'উহুঁ, শুধু মুখে বলছিনা। কবে সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন বলুন ?' অনীতার মা উঠানে এসে দাঁড়ালেন, 'পাত্র কিছু বলেছে নাকি রে ?'

নন্তু গম্ভীরভাবে দাওয়ায় গিয়ে বসলো। পকেট থেকে রুমাল বের করে হাওয়া খেতে খেতে বললো, 'পাঁজি দেখে দিন ঠিক করে ফেলুন মাসীমা। সরোজের অনীকে খুব পছন্দ হয়েছে।'

নন্তুর কথা শেষ হবার আগেই অনীতার মা আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

'অনী, অনী কোন্ ঘরে,' ডাকতে ডাকতে নন্তু ভেতরের ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

উঠানে নন্তু এসে দাঁড়াতেই অনীতা ছুটে ঘরে ঢুকেছিলো কিন্তু কানদুটো খাড়া করে রেখেছিলো বাইরের দিকে। কাজেই কথাবার্তা সবকিছুই কানে গিয়েছিলো। নন্তু ঘরে ঢুকতেই ধরা পড়ার ভয়ে অনীতা পিছন ফিরে জানলার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

'কিরে, কবে খাওয়াচ্ছিস বল্ ?' নন্তু হাসতে হাসতে

জিজ্ঞাসা করলো।

'ঘটক বিদায় তোমার পাওনা রইলো বই কি নন্তুদা।' অনীতা ঘাড় না ফিরিয়েই উত্তর দিলো।

'সরোজ কি বলেছে জানিস অনী।' নন্তু আব একটু এগিয়ে এলো।

কোন কথা না বলে অনীতা ঘুরে দাঁড়ালো। সরোজ কি বলেছে জানতে হবে বৈকি। অনেকদিন আগের পরিচয়ের সামান্য ইসারা, কিংবা গরীবের মেয়েকে দয়া করে ঘরে ঠাঁই দিয়ে বদান্য-তার নিদর্শনই হয়ত। নন্তু চাপাগলায় বললো, 'সবোজ বলেছে এত মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন চোখ আমি কারুর দেখি নি ভাই। দেখলেই মনে হয় যেন কতদিনের চেনা। আরও একটা কথা কি বলেছে জানিস, বলেছে এমন চোখ যার সে জীবনে কোনদিন কাউকে ফাঁকি দিতে পারে না। নির্ভয়ে বাসা বাঁধা যায় একে নিয়ে।'

অনীতাব মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরে উঠলো। ঘরের দেয়াল, আলনা, ছবি সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো। দুহাতে শক্ত কবে জানলাব গরাদটা ধবে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে যখন মাথা তুললো তখন বুকের মধ্যে একটা বেদনা মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলো। মনে হলো বুকটা ভেঙে বুঝি খান খান হয়ে যাবে। কেন এমন কথা বললো সরোজ! ওর বাঁশীর মতনই কান্নার আওয়াজ দিকে দিগন্তে

কেন ছড়িয়ে দিলো এমনি ভাবে।

দুহাতে বুকটা চেপে অনীতা বাইরে এসে দাঁড়ালো। রান্না-ঘরের দাওয়ায় ওর মা আর কাকা বিয়েরই জল্পনা কল্পনা শুরু করেছেন। দেনাপাওনার হাঙ্গামা নেই যখন বিশেষ তখন যত তাড়াতাড়ি চার হাত এক করে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।

অনীতা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অনীতার মা মুখ তুললেন, 'না, তোর জন্য আমি মাথা খুঁড়ে মরবো নীতা। নন্তু আসতে যেই আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছি, অমনি তুই খাবার ছেড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিস। নে, উনুনের পাশে সব ঢাকা আছে, খেয়ে নিগে যা।'

অনীতা কিন্তু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে মার আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো, 'একটা কথা বলবো মা।'

'কিবে ?'

'কদিন সন্ধ্যেবেলা বামুন পিসীকে রামায়ণ শোনাচ্ছিলুম, একটুখানি আর বাকী আছে, আর তো বেশী বাড়ী থেকে বেরোতে পারবো না, আজ গিয়ে বাকিটুকু শুনিয়ে আসবো মা ?'

মা একটু আপত্তির সুর তুলতেই মাঝ থেকে কাকা বললেন, 'আহা বেচারী সকাল থেকে ঘরে বন্দী, যাক্ একটু ঘুরে আসুক। সত্যিই তো, এরপর হট হট করে তো আর এখানে সেখানে যাওয়া চলবে না।'

মা তবু ছাড়লেন না, 'যাচ্ছো যাও, এখুনি ফিরে আসবে। আর গীতা সঙ্গে যাক।'

হ্যারিকেন হাতে গীতাকে নিয়ে অনীতা বেরিয়ে পড়লো। চণ্ডীতলার কাছ বরাবর এসেই গীতা বেঁকে দাঁড়ালো, 'ও দিদি, এদিকে কোথায় বামুন পিসীর বাড়ী, সুপুরীবাগান দিয়ে কোথায় যাচ্ছো ?'

'একটুখানি আর এক জায়গা ঘুরে যাবো, লক্ষ্মীটি আয় একটু।' অনীতার গলা কেমন ভাব ভার।

নন্তুদেব বাড়ীর সামনে এসেই অনীতা একটু থমকে দাঁড়ালো, 'গীতা তুই একটু দাঁড়াতো, এখানে আমি এখুনি আসছি।'

হ্যারিকেন হাতে একটু এগিয়েই অনীতা দাঁড়িয়ে পড়লো। কে একজন উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু এগিয়ে আসতেই অনীতা সরোজকে চিনতে পারলো। সরোজও বোধ হয় চিনতে পেরেছিলো অনীতাকে, তাই বললো, 'একটু দাঁড়ান, নন্তুকে ডেকে দিচ্ছি।'

'নন্তুদাকে দরকার নেই। আপনি শুনবেন একটু ?'

'আমি !' সরোজ হকচকিয়ে গেলো একটু, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো।

বাতাবীলেবু গাছের তলায় অনীতা থামলো, বললো, 'আমায় চিনতে পেরেছেন নিশ্চয় ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' সরোজ আমতা আমতা করলো, 'আপনাদের বাড়ীই তো আজ বিকেলে—'

'হ্যাঁ,' অনীতার গলার আওয়াজ অসম্ভব গম্ভীর, 'তখন শুধু

চোখদুটোই দেখেছিলেন, আর কিছু দেখেন নি। এই দেখুন।'

একহাতে হ্যারিকেন ধরে, অনীতা আর একহাতে আস্তে আস্তে শাড়ীটা তুলতে লাগলো। হাঁটুর কাছ বরাবর এসে শাড়ীটা মুঠো করে ধরে রইলো।

হ্যারিকেনের স্বল্প আলোতে কিন্তু সরোজের দেখার কে' অসুবিধা হলো না। হাঁটুর ঠিক নিচে আধুলী পরিমাণ জায়গা জুড়ে শ্বেতির দাগ। একবার হেঁট হয়েই সরোজ পিছিয়ে এলো।

সমান্তর

মাধবী ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলো। ইতস্তত করলো দু' এক মিনিট। কোন রকমে পিছু হেঁটে বেরিয়ে যাওয়া যায় না? আস্তে আস্তে। সামনের মানুষটা মুখ তুলে চাইবার আগে। কিন্তু তারপর। এ পালিয়ে যাওয়ার পরিণতি। আশ্রয় থেকে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়ার নামান্তর, আলো থেকে অন্ধকারে মুখ ফেরানোর মতন।

একটু হয়তো শব্দ হয়ে থাকবে। হাইহিলের সঙ্গে মোজেইক মেঝের ছোঁয়াছুয়ি, কিন্তু সেই আওয়াজেই অতনু বোস মুখ তুলে চাইলেন। কুশ্রী, কদর্য মেটে রংয়ের মুখ, কুতকুতে চোখ,

নাকের বালাই নেই, রক্ত খাওয়া জোঁকের মতন পুরু ওষ্ঠাধর। ভুরু নেই, ভুরুর ইশারা, তাই কুঁচকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'কি চাই বলুন ?'

মানুষের চাওয়ার কি শেষ আছে! বিশেষ ক'রে সব কিছু খুইয়ে আসা পর-নির্ভর মেয়ের। এত কথা বললো না মাধবী, কেবল সন্তর্পণে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের ক'রে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

অতনু চিঠিটার ওপর চোখ ছুঁইয়েই আবার মুখ তুললেন, 'ও আপনি ইন্টারভ্যু দিতে এসেছেন ? শর্টহ্যাণ্ড আপনার জানা আছে ?'

চেয়ারের হাতলে হাত রেখে মাধবী আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো। সঙ্কোচ জড়ানো গলায় বললো, 'না, বিজ্ঞাপনে শুধু টাইপের কথাই লেখা ছিলো।'

'তা ছিলো' অতনু বোস এবার মুখ তুললেন না। সামনে রাখা অফিসের সরকারী কাগজে সই করতে করতে বললেন, 'বাড়তি গুণ থাকা দোষের নয়। পুণ্যের বোঝা যতো ভারী হয়, ততই ভালো। একেবারে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছোনোর পরোয়ানা পাওয়া যায়।'

মাধবী কোন উত্তর দিলো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। অফিসের অভিজ্ঞতা ওর প্রথম নয়। বছর চারেকের মধ্যে আরো দু' দুটো অফিসে চাকরি করেছে। চাকরি করতে করতেই টাইপ শিখেছে, ওই বাড়তি পুণ্যফলের ভরসায়। কিন্তু সুবিধা হয় নি।

প্রথম অফিসটাই উঠে গেলো হঠাৎ, আর দ্বিতীয় অফিসে ছাঁটাইয়ের করাত পড়লো একেবারে ঘাড় ঘেঁষে। মুখ ফুটে কিছু বলতে দিলো না।

এখানে এখনো পাকাপাকি কিছুই নয়, পছন্দ করার পর্যায়। চোখে লাগে তো টিকে যাবে। ভয় মাধবীর সেই-খানেই। পছন্দের ভার যদি অতনু বোসের ওপর থাকে, তবে মাধবীর নাকচ হ'য়ে যেতে একটুও দেরি হবে না, অবশ্য পুরোনো কথা যদি মনে থাকে।

পুরোনো কথা যে মনে আছে হাবেভাবে অতনু বোস সেরকম কিছুই দেখালেন না। না মুখের ভাষায়, না চোখের চাউনিতে।

'আপনি ভিজিটার্স রুমে একটু অপেক্ষা করুন। এগারোটা নাগাদ সবাইকে ডাকা হবে। অতনু এবারে মুখ তুললেন। সোজাসুজি চাইলেন মাধবীর দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টিতে চিনতে পারার কোন চিহ্ন নেই, পরিচয়ের ক্ষীণ রেখাও নয়।

কিন্তু মাধবীর ভুল হয় নি। একটুও নয়। বছর সাত আট, তার বেশি নয়। আজকের মতন চাকুরিপ্রার্থিনী নয় মাধবী, ডেপুটি বাপের সযত্নলালিত। চলাফেরায় হালকা আভিজাত্য, সব কিছুতেই উন্নাসিকতার আমেজ। ধরাকে সরাজ্ঞান না হ'লেও, ধরাজ্ঞান যে করতো না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিলো না। মফঃস্বল শহর, কিন্তু খালবিল দিয়ে আধুনিকতার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তটে তটে। চলতি ফ্যাশান আর সৌন্দর্যচর্চার

আধুনিকতম প্রক্রিয়া। শিফনশাড়ি আর বেআব্রু ব্লাউজে শহরের যে কোন উৎসবে দেখা যেতো মাধবীকে। সভা সমিতি সব কিছুতে। দেখতে যাওয়া তো নয়, দেখাতে যাওয়া। সূর্য-মুখীর মতন নিজেকে তুলে ধরা দিবাকরের দিকে। স্তাবকের দল জুটলো অতি সহজেই। ফুলকে ঘিরে মধুপের গুঞ্জন। কিন্তু ওই গুঞ্জনই। কাছে আসার সুবিধে নেই। আভিজাত্যের উঁচু বেড়ায় অবহেলার কাঁটাতার জড়ানো। দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস, সান্নিধ্য বাঁচিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ, শহরের উঠতি বয়সের ছেলেরা এইটুকুই সম্বল করলো। দু' একজন দুঃসাহসিক প্রতিবেশী আলাপ করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু শুরুতেই শেষ। ব্যাপার দেখে বেশী এগোবার সাহস করে নি।

কিন্তু পড়শীরা যে-সাহস করে নি, সেই সাহস করলো নবা-গত এক ছোকরা। হঠাৎ একদিন নয়, দিনের পর দিন।

স্কুল ফেরত। বাজার পর্যন্ত কোন অসুবিধা নেই। লোক জনে সরগরম। হৈ চৈ গোলমাল লেগেই আছে। তারপরের পথটুকু নির্জন। আতাবাগানের ভিতর দিয়ে পায়ে চলা পথ, ঘাসের পাড় বসানো। কাশফুল আর উলুখড়ের জঙ্গল। মজাডোবায় কচুরীপানার বাহার। মোগলদের হটাবার জন্য কোন ভুঁইয়া কেল্লা তৈরির চেষ্টা করেছিলো কবে, তারই ভগ্নাবশেষ।

এ ছাড়া অবশ্য ডেপুটির বাংলোয় পৌঁছোবার সদর রাস্তাও আছে। কাছারির পিছন দিয়ে টানা সড়ক। কিন্তু বেশ ঘুরপথ।

ঘণ্টাখানেকের ওপর সময় লাগে। তাই বইয়ের গোছা বুকে নিয়ে মাধবী মেঠোপথে নেমে পড়ে। বর্ষাকালে যা একটু অসুবিধা, অন্য সময় খটখটে পরিষ্কার। সঙ্গে চাপরাশী যাবার কথা হ'য়েছিলো, ভুরু কুঁচকে মাধবী সে ব্যবস্থা নাকচ ক'রে দিয়েছিলো। বিশ্রী লাগে চোগাচাপকান পরা দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে। সম্ভ্রমে নয়, খোঁচা লাগে নারীত্বে। নিজেকে পর-নির্ভর মনে হয়।

সঙ্গে দু' একজন মেয়ে অবশ্য থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাধবী একলা। কামিনীপুকুর থেকে সারাটা পথ।

ক'দিন আগে লক্ষ্য ক'রেছিলো, কিন্তু বিশেষ আমল দেয় নি। বাঁশঝাড়ের পিছনে বিরাট পড়ো বাড়িটা মেরামত শুরু হ'য়েছে। বাঁশের ভারা বেঁধে ভেঙে পড়া কার্নিশের সংস্কার। নোনা ধরা ইঁট বদলে নতুন ইঁটের আমদানী। মিস্ত্রীমজুরে সবগরম। দিন বিশেক কি অতও নয়। নতুন কলি ফিরোনো ঝকঝকে অট্টালিকা। এ ধরনের বাড়ি এ তল্লাটে একটিও নেই।

তন্ময় হ'য়ে বাড়ির রূপ দেখতে দেখতে মাধবীর খেয়াল হ'লো বাঁশঝাড়ের পিছন থেকে একজনের তীক্ষ্ণ চক্ষু তাকে যাচাই করছে। নিষ্পলক দৃষ্টি। চোখাচোখি হবার পরেও দৃষ্টি সরাবার চেষ্টা নেই। আরক্ত হ'য়ে উঠেছিলো মাধবীর-মুখ, দু'টি হাত মুষ্টিবদ্ধ। নির্জন জায়গা, তাই একটু ইতস্তত করেছিলো। নয়তো রাস্কেলটাকে শায়েস্তা করার ওষুধ ওর অজানা নয়।

অতনু বোসের সঙ্গে সেই প্রথম দেখা। গোধূলিলগ্ন, মাসটা

শরতের শেষ। অজস্র শিউলি মাড়িয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে মাধবী আর একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছিলো। মানুষটা সরে গেছে, কিন্তু দৃষ্টি যেন পিছু নিয়েছে সারাটা পথ। পিছন ফিরে চাইতে মাধবীর সাহস হয় নি। কদর্য একটা মুখের কুৎসিত চাউনির ভয়ে।

পরের দিন থেকেই মাধবী চাপরাশীকে সঙ্গে নিয়েছিলো। সহপাঠিনীদের হাসি টিটকারী সব উপেক্ষা ক'রে। তবে ঠিক পাশে পাশে চলতে দেয় নি। বইয়ের বোঝা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। বেশ খানিকটা তফাতে। পিছনে মেয়ের দল কলরব করতে করতে চলেছে। একলা হ'য়ে যাওয়ার পরও মাধবী চাপরাশীর কাছাকাছি আসে নি, কেবল একটু দ্রুত করেছে চলার গতি, বিশেষ ক'রে সেই নতুন বাড়িটার সামনাসামনি এসে।

দিন বিশেক। কোন সাড়াশব্দ নেই। কোন মানুষের চিহ্নও নয়। নতুন বাড়ি ফাঁকা। বাড়িঘর সারিয়ে মানুষজন সব গেলো কোথায়! হদিস মিললো দিন কয়েক পরেই। নতুন বাড়ির সামনাসামনি নয়, আরো এগিয়ে। বাবলাঝোপের কাছ বরাবর।

'তুমি কার চাপরাশী হে?' শুধু আওয়াজ, মানুষটাকে দেখা গেলো না। শব্দ মাধবীরও কানে গিয়েছিলো, কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পায় নি। তাছাড়া অনেকটা পিছনেও ছিলো।

চাপরাশী নিবারণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। মানুষটা তার ঠিক নজরে এসেছিলো। ফাটা চাতালে ছিপ নিয়ে লোকটি

তন্ময়। কিন্তু পরিশ্রম বৃথা। কলমীর দামে আটকে সুতোর দফা রফা কিংবা কচুরিপানার জঙ্গলে ছিপসুদ্ধ নিখোঁজ। মাছ চুলোয় যাক, আঁশের টুকরো নেই ধারে কাছে। নতুন মানুষ, এত সব জানবেই বা কি ক'রে। অবশ্য নিবারণ সে সব কথা কিছু বললো না, শুধু থেমে রাস্তার শেষ বরাবর গিয়ে কথার উত্তরে বললো, 'আজ্ঞে মিত্তির সায়েবের!'

'ডেপুটি মিত্তির!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ততক্ষণে মাধবী এগিয়ে এসে গেছে। চাপরাশীর কাছ বরাবর।

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি বকবক করছিস?' এবারে বাবলা-ঝোপের ফাঁক দিয়ে গোটা মানুষটা নজরে এসেছে। নজরে আসা তো নয়, গায়ে যেন লঙ্কা ছিটিয়ে দেওয়া। সমস্ত শরীর জ্বলে ওঠে।

'আজ্ঞে না, দিদিমণি, ডাক্তারবাবুর ভাগ্নে জিজ্ঞাসা কর-ছিলেন, তাই বলছিলুম।'

ডাক্তারবাবুর ভাগ্নে। নামধাম ঠিকুজিকোষ্ঠী সব জোগাড় করেছে নিবারণ! ডাক্তারটি আবার কে? তাঁর মূর্তিমান ভাগ্নে-টিকে তো সামনেই দেখা যাচ্ছে। সেই নিষ্পলক কটাক্ষ। অকুণ্ঠিত চাউনি। লাজলজ্জারও ধার ধারে না লোকটা। ভদ্রতার বালাই নেই। কচুরিপানার জঙ্গলে ফাত্না ডুবিয়েছে, কিন্তু নজর জল ছেড়ে ডাঙায়।

চাপরাশীর পাশ কাটিয়ে মাধবী হন হন করে এগিয়ে গেলো। যাবার আগে তিরিক্ষে মেজাজের ছিটে ছড়িয়ে গেলো, 'নে যাবি তো চল। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। নয়তো তুই তোর আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নে, আমি চললুম।'

কথাগুলোর মধ্যে শুধু জ্বালাই নয়, মর্মান্তিক বিদ্রূপও লুকোনো ছিলো। ভদ্রতাবিরুদ্ধ ইঙ্গিত। কিন্তু অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও মাধবী কোন উত্তর শুনতে পেলো না। বাঁকা কথার বাঁকা উত্তর তো নয়ই, সোজা জবাবও নয়।

বাড়তি খবর মিললো বাড়ি গিয়ে। নতুন সিভিল সার্জন এসেছেন পরিতোষ গুহ। ভদ্রলোকের জায়গাটা খুব ভালো লেগে গিয়েছে। তাই এসেই পড়োবাড়ি কিনে নিয়ে সংস্কারের বন্দোবস্ত। বয়স হ'য়েছে। হয়তো এখান থেকেই রিটায়ার করবেন। আর ঘোরাঘুরি নয়। এখানেই স্থায়ী আস্তানা। ছেলেপুলের হাঙ্গামা নেই। প্রথম যৌবনে আঁতুড়ে একটি বিনষ্ট, ব্যস তারপরেই খতম। প্রথম প্রথম ওষুধবিষুধ, তাগা মাদুলী, জলপড়া অনেক কিছু হ'য়েছিলো। টাকা খরচও কম করেন নি। কিন্তু ফল কেবল হা-হুতাশ। পুন্নাম নরকে পচে মরার পাকা পাকি বন্দোবস্ত। ডাক্তার মানুষ, কিন্তু স্ত্রীর বিশ্বাসে বাধা দেন নি। কোথা দিয়ে কি হয়, বলা যায় না। শেষকালে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ভগবানকে মানত করা ছেড়ে নিজেদের অদৃষ্টকে দায়ী করেছেন। সবই বরাত, নইলে আর এমনটি হবে কেন। বুড়োবয়সে দেখাশোনার কেউ থাকবে না।

বংশে বাতি দিতে কেউ নয়। চোখ বুজলেই বারো ভূতের দৌরাত্ম্য।

অনেক ভেবে চিন্তে এক উপায় বের করেছিলেন। পোষ্য পুত্র। কুলশীল মিলিয়ে কাউকে ঘরে আনা। জানাশোনা হ'লেই সুবিধা। নয়তো অজ্ঞাতকুলশীলস্য কাকে ঠাঁই দেবেন ঘরে। মরণকালে জল দেওয়া চুলোয় যাক, জ্যান্ত অবস্থাতেই সম্পত্তির লোভে না চিতায় ওঠায়। বরাত ডাক্তার সায়েবের। হাতের কাছেই জলজ্যান্ত ভাগ্নেকে পাওয়া গেলো। কাশীবাসী ছোট-বোন খবর পেয়ে নিজে গছিয়ে গেলেন। থান কাপড়ের কোণে চোখ মুছে আনন্দাশ্রুও বিসর্জন করলেন ছেলেটির একটা গতি হ'লো দেখে।

ছেলে অতনু কাশীতে সিদ্ধি খেয়ে এক্কা চড়ে বেড়াতো, এখানে মামার ব্যাপার দেখে একটু হকচকিয়ে গেলো। বইপত্তর কিনে, মাস্টার রেখে অতনুকে মানুষ করার এক এলাহি ব্যাপার। রোজ স্কুল যাওয়া, বাড়িতে নিয়মমত পড়া, দুদিনে অতনুর প্রাণ ডানা ঝাপটাতে শুরু করলো। বিধবা মায়ের জন্য উথলে উঠলো শোক।

কিন্তু মামাও হার মানলেন না। স্কুলের পর স্কুল বদল। মাস্টাররা বাড়িতে এসে হাতজোড় ক'রে ছেলে ফেরৎ দেয়। এ ছেলে নিজে ক্লাসে উঠবে না বটে, কিন্তু ক্লাসে থাকলে স্কুল উঠিয়ে ছাড়বে। বাড়ির মাস্টারেরও একই অনুযোগ। শুধু ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠাতেই মাস্টার আধমরা, পাশ করাতে আর হাড়মাস

কিছু থাকবে না।

অবস্থা বুঝে ডাক্তার গুহ পোষ্যকে স্কুল ছাড়ালেন। লেখা-পড়ায় যাই হোক, দয়াধর্ম আছে ছেলেটার। মামামামীর অসুখে জীবন দিয়ে পড়ে। এইটুকুই তো দরকার ছিলো। লেখাপড়া তেমন না হ'লেও ক্ষতি নেই। ডাক্তার গুহ যা রেখে যাবেন, এক পুরুষের হেসে খেলে খুব চলে যাবে তা'তে। কোন অসুবিধা নেই। মামামামীর ওপর টান থাকাটাই আসল।

ডাক্তার গুহ মাধবীর বাবার কাছে এসেছেন মাঝে মাঝে। ডিপুটি মিত্তিরও পাল্টা জবাব দিয়েছেন। আকর্ষণ দাবা। একবার বসলে দু'জনের কারুরোই জ্ঞান থাকে না। নৌকা আর গজ সামলাতে মাঝ রাত। মন্ত্রী বেকায়দায় পড়লে তো কথাই নেই। টেনে তোলাই দায়।

আরো কিছু খবর মিললো বাপের মারফত। টানাহেঁচড়া ক'রে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন ডাক্তার গুহ। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে। এবার কোন একটা ব্যবসায়ে নামিয়ে দেবেন। জানাশোনা কারবারীর হাতে। জোয়ান মদ্দ ছেলে ব'সে ব'সে অন্ন ধ্বংস করবে এই বা কেমন কথা।

বেয়ারা সামনে শ্লিপ রাখতেই মাধবীর পুরোনো চিন্তার জাল ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো। গোপীপুরের মাট ঘাট পথ, মানুষজন উধাও। নতুন আবেষ্টনী, কিন্তু মানুষটা পুরোনো সন্দেহ নেই। ডাক্তার গুহ পোষ্যটিকে বোধ হয় ওষুধের ব্যবসায়ে তালিম

দিয়েছিলেন, নয়তো এক বছরে ওরিয়েন্টাল মেডিসিন কোম্পানীর সেজবাবুর চেয়ারে আঁট সাঁট হ'য়ে বসতে পারতো না অতনু বোস। হোমরা চোমরা একজন। মাধবীর মতন হাত-পেতে-দাঁড়ানো মানুষের অন্নদাতা। এই দুর্দিনে প্রায় ভাগ্য-বিধাতার স্বগোত্র।

কিন্তু সত্যিই কি চিনতে পারে নি অতনু বোস? সেদিনের সব অপমানের কালি নিঃশেষে ধুয়ে মুছে ফেলেছে? বাইরের কালিটুকুই না হয়ে ধুয়েছে কিন্তু ভিতরের জ্বালাটুকু! এত সহজে তার দাহও কি নিভে গেছে!

মাধবী উঠে অতনুর চেম্বারে এসে ঢুকলো। সামনের চেয়ারে গুটি তিনেক মেয়ে। তার মধ্যে দু'টি অ্যাংলো। চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে মাধবী তিনজনকেই দেখলো। উগ্র প্রসাধন আর স্বল্পবেশ। অ্যাংলো মেয়ে দু'টির পাশে শাড়ি-পরা মেয়েটা কেমন নিষ্প্রভ। কালীঘাটের রংচটা পুতুলের মতন। অনেক সঙ্কোচ, অনেক দারিদ্র্য পিছনে ফেলে এসেছে। শুধু তো চৌকাঠ পার হওয়াই নয়, কিছুটা শালীনতা আর সম্ভ্রমবোধও বুঝি পার হ'য়ে আসা।

মাধবী ঘরে ঢুকতেই অতনু বোসের ইশারায় মেয়ে তিনটি উঠে দাঁড়ালো তারপর অতনুকে অভিবাদন ক'রে মাধবীর পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে গেলো।

আবার মুখোমুখি। মাধবী আর অতনু। সেই পুরোনো দিনের মতনই। কিন্তু চাকা ঘুরে গেছে। সেদিন দেবার মালিক

ছিলো মাধবী। অতনুর প্রসারিত হাতের ওপর সম্মতির ফুটো পয়সা। কিছু করুণার ছিটে। আজ অতনুই সব কিছু দেবার মালিক। আঘাতে আঘাতে নুয়ে পড়া মাধবীর সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার আশ্বাস থেকে শুরু ক'রে তার বাঁচবার ইশারা।

'সাতজনকে ডাকা হ'য়েছে, তার মধ্যে একমাত্র আপনিই শর্টহ্যাণ্ড জানেন না।' প্রত্যেকটি কথা অতনু চিবিয়ে চিবিয়ে বললো। জোর দিয়ে দিয়ে। শর্টহ্যাণ্ড না জেনে দরখাস্ত করাটা যেন মাধবীর পক্ষে অপরাধই হ'য়েছে।

মাধবী পঙ্গু কৈফিয়ৎ দেবার মুখেই বাধা খেলো। অতনু বোস সোজা হ'য়ে বসেছেন। দামী সিগারেটের টিন খুলে আলতো একটা সিগারেট কদর্য ছ'টো ঠোঁটের ফাঁকে নিলেন। কসরৎ ক'রে দেশলাই জ্বালালেন ছ' আঙ্গুলের সাহায্যে। ছোট ছোট ধোঁয়ার রিং ওপরের দিকে। পাঁশুটে ধোঁয়ার আস্তরণ ছ'জনের মাঝখানে। একটু বিচলিত হ'লো মাধবী। অযথা এত কায়দা দেখানোর প্রয়াস। তাহ'লে বোধ হয় চিনতে পেরেছে অতনু। চিনতে না পারাটাই তো আশ্চর্য। এমন কিছু বদলায় নি মাধবী। একটু শীর্ণ হ'য়ে গেছে শুধু, অভাবের ছায়া ছ'টি চোখের মণিতে, আর হয়তো ফ্যাকাসে ঠোঁটে রক্তহীনতার আমেজ। এইটুকুই। সব কিছু খুইয়ে আসা মানুষের তুলনায় এ আর কতটুকু। অতনু বোস চিনতে না পারার মতন বদলাতে পারে নি মাধবী।

'শিখে নিতে পারবেন না ক' মাসে? এমন আর শক্ত কি।

অনেকেই কাজ করতে করতে শিখে নেয়।' অতনু বোসের গলার আওয়াজে মাধবী চমকে উঠলো। চাউনিতে পরিচিতির সঙ্কেত ছিলো না কিন্তু নরম গলার স্বরে ঘনিষ্ঠতার ছোঁয়াচ। চাকরির আবেদন-নিয়ে এসেছে এমন মেয়ের সঙ্গে এ সুরে কেউ কথা বলে না। পুরোনো পরিচয়ের সেতুর ওপর না দাঁড়ালে এমন আর্দ্র হয় না কারো গলার আওয়াজ।

মাধবী ঘাড় নাড়লো। হ্যাঁ, শিখে নেবে। যেমন ক'রে টাইপ শিখেছিলো কাজ করতে করতে, তেমনি ক'রে শর্টহ্যাণ্ড আয়ত্ত করবে।

অতনু বোস কোন উত্তর দিলেন না। মাধবীর ঘাড় নাড়া লক্ষ্য করেছেন এমনও মনে হ'লো না। চেয়ার ঘুরিয়ে বুককেস থেকে মোটা বই বার করলেন। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে থেমে পড়লেন এক জায়গায়, তারপর খোলাপাতা সুদ্ধ বইটা মাধবীর দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এই পাতাটা টাইপ ক'রে নিয়ে আসুন। প্রথম কুড়ি লাইন। বাইরে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলেই মেশিন দেখিয়ে দেবে।' আবার ধোঁয়ার চক্র। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার শব্দ। বেয়ারা এসে পাশে দাঁড়ালো। সঙ্গে ক'রে মেশিনে বসিয়ে দেবে।

অতনু বোসের চেম্বারে ধোঁয়ার চাপে এমন কিছু ঝাপসা ঠেকে নি মাধবীর, কিন্তু ঝাপসা ঠেকলো বইয়ের পাতার দিকে চোখ বুলিয়ে। ওষুধের ফরমূলার ব্যাপার। সাঙ্কেতিক চিহ্ন আর অঙ্কের জটলা। সোজাসুজি ইংরেজী ভাষা হ'লে অসুবিধার কিছু

নেই, কেবল দ্রুত চাবি টেপার কৌশল। তার মানে তিনগুণ সময় নেবে, নির্ভুল হবে সব কিছু এমন প্রত্যাশা করাও দুরাশা। মাধবী আলতো হাতে কপালের-ওপর-জমে-ওঠা ঘামের ফোঁটা-গুলো মুছে নিলো। গরম হ'য়ে উঠেছে কানের দু'টি পাশ। নিশ্চয় চিনতে পারে নি অতনু বোস। পারলে এমন কাঁটাঝোপের ওপর মাধবীকে আছড়ে ফেলতে পারতো না। সোজাসুজি কোন চিঠি টাইপ করতে দিলেই পারতো। দেনাপাওনার ব্যাপার, কিংবা সহজ বানানের কোন ওষুধের লোভনীয় অর্ডার।

সেদিনের চিঠিটাও তো সোজাসুজিই ছিলো। লাইন তিন চার। আঁকাবাঁকা অক্ষরে আত্মনিবেদন। কাগজটা যেমন দামী, চিঠির ভাষা সেই পরিমাণে খেলো। মুখ থুবড়ে থুবড়ে পরীক্ষার পাঁচিল পার হওয়া ছেলের কাছে এর বেশী অবশ্য মাধবী আশাও করে নি।

কথাটা উঠেছিলো ডাক্তার গুহের তরফ থেকেই। দাবার আসরেই মাধবীকে দেখেছিলেন। কোথায় জলসার উৎসবে যাবার আগে মাধবী বাপকে বলতে এসেছিলো।

ঝলমলে শাড়ি, অগুরুর সুরভি, হাল্‌কা চুড়ির শব্দ, নৌকো-গজ-মন্ত্রী নিয়ে বেসামাল হওয়া ডাক্তার গুহের নজর এড়ায় নি। বাঃ মেয়ে তো নয়, লক্ষ্মী প্রতিমা। অতনুর পাশে বেশ মানায়।

স্নেহান্ধ প্রৌঢ়ের মোহাবেশ মাধবী ইচ্ছা করলেই ভেঙে দিতে পারতো। রূঢ় আঘাতে। মানায় বই কি, চমৎকার মানায়।

জলহস্তীর পাশে মৎস্যকন্যার মতন। আঁকা ভুরু বাঁকা করে-ছিলো, কিন্তু কি ভেবে সামলে নিয়েছিলো নিজেকে। কেলেঙ্কারি গড়াতে দেয় নি।

কিন্তু তলায় তলায় ব্যাপারটা এগোতেই মাধবী ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ক'দিন থেকেই ফিসফাস, ওকে বাদ দিয়ে নিচু গলায় পরামর্শ, কেমন একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ। কিছুটা আঁচ করেছিলো। ওকে দেখতে আসবে তারই বন্দোবস্ত। এর আগেও এসেছিলো বারতুয়েক। শহরের কেউ নয়। দূর দূর জায়গা থেকে। একবার পাত্রের বাপ আর একবার পাত্র নিজে। মন্দ লাগে না মাধবীর। সেজেগুজে সামনে গিয়ে বসতে। বোকা বোকা প্রশ্নের চোখা চোখা উত্তর। কিন্তু এবার ব্যাপার আরো ঘোরালো। দূরের লোক নয়, এবার আসছে কাছের লোক। একেবারে অচেনাও নয়।

ব্যাপারটা দেখতে আসা অবধি আর গড়ালো না। দেখা-দেখির পালা তার আগেই সাঙ্গ।

ছুটির দিন। মাধবী দোকানে গিয়েছিলো রেকর্ড কিনতে। ঘণ্টা তুয়েক ধ'রে কয়েকখানি গান শুনলো। ইনিয়ে বিনিয়ে মেয়েলী গলার, কিছু নারীশিল্পীর পরুষ কণ্ঠে। একটাও পছন্দ হ'লো না। মেজাজ খারাপ। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে লম্বা লম্বা পা ফেলে মাধবী বাড়িমুখো হ'লো। দূর, দূর, মফঃস্বল শহরে আবার মানুষ থাকে। মনের মতন জিনিস পাবার উপায় নেই। সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।

বাঁকের মুখে। পিছনে সাইকেলের শব্দ শুনে মাধবী পথ ছেড়ে ঘাসের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিলো। কেয়াঝোপের ধার ঘেঁষে। সাইকেল পাশ কাটালো না, একেবারে পাশে এসে থামলো।

'সাইকেলের ঘণ্টা আপনাকে সরাবার জন্য নয়, ফেরাবার জন্য।' একেবারে কানের কাছে। মাধবীর মনে হ'লো কে বুঝি কানের কাছে মুখ নিয়েই বললো কথাগুলো। কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশারই ব্যাপার।

ভুরু কুঁচকে মাধবী ফিরে দাঁড়ালো। এক পা রথে এক পা পথে। মাথায় তালপাতার টুপি। সবুজ শার্টের ওপর আড়া-আড়িভাবে ক্যামেরার স্ট্র্যাপ ঝোলানো। আঁকাবাঁকা দাঁতের সার। দু' চোখে নেকড়ের লোলুপতা।

মাধবী কিছু বলার আগেই অতনু কথা বললো, 'সামনের রবিবার আপনাকে দেখতে যাচ্ছি আমি আর মামা সন্ধ্যা নাগাদ। সেজেগুজে রেডি হ'য়ে থাকবেন।'

মাথা ঝিমঝিম করা রোদ, বিবর্ণ গাছের পাতা, জল নেই, কেবল পাঁক। পাংশু রুক্ষতা। মাধবী দাঁতে দাঁত চাপলো, 'কি বলতে চান আপনি?'

আর একটা কথা! মাধবী নিজেকে সামলাতে পারবে না। পায়ের কাছে পড়ে থাকা কঞ্চির টুক্‌রো কুড়িয়ে এলোপাথারী মার। মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু ভগবানের দেওয়া ও কদর্য মুখকে আর কত বিকৃত করতে পারবে। তা না পারুক, এমনভাবে

নির্জন পথে ঘাটে মেয়েছেলের পিছু নেওয়া তো বন্ধ করতে পারবে।

অতনু বোস মাথা নিচু করলো। মুখে চোখে যেন লজ্জার ছায়া। পকেটে হাত দিয়ে কাগজের টুক্‌রো বের করলো, তারপর স্তিমিত গলায় বললো, 'আমি আবার একটু লাজুক। মুখ ফুটে সব বলতে পারি না। আপনি পড়ে দেখবেন।'

সাইকেল সরে যাবার অনেকক্ষণ পরে মাধবীর খেয়াল হ'য়েছিলো। কচুপাতার মধ্যে আটকে কাগজটা থর থর ক'রে কাঁপছিলো। এক'পা দু'পা এগিয়েও মাধবী দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। কি হবে চিঠিটা কুড়িয়ে। বিষয়বস্তু তো জানাই। কিন্তু তবু কৌতূহল দমন করতে পারে নি। এদিক ওদিক চেয়ে কাগজের টুক্‌রো কুড়িয়ে নিয়েছিলো।

ঘড়ির দিকে চেয়েই মাধবী চমকে উঠলো। সর্বনাশ, দশ মিনিটের ওপর মেশিন কোলে ক'রে সে বসে আছে। একটি লাইনও টাইপ শুরু করে নি। টাইপ করতে গিয়েই মুস্কিল বাধলো। কেবলই পুরোনো চিঠিটা ভেসে আসে চোখের সামনে। আঁকাবাঁকা অক্ষরের সার। সেদিনের খণ্ড খণ্ড করে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া চিঠির টুকরো।

চেম্বারে ঢুকতেই অতনু বোস কবজির দিকে নজর দিলেন। ভুরু কোঁচকালেন বিরক্তিতে। চাপা গলায় বললেন, 'অসম্ভব দেরি।' কথাটা বললেন ইংরেজীতে।

টাইপ করা কাগজটা সামনে নিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে গোটা

চারেক ভুল মাধবীর সামনেই কাটলেন তারপর হঠাৎ কি মনে হতে মুখ তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি আসুন। আপনার ঠিকানা তো রয়েইছে আমাদের কাছে, খবর পাঠাবো।'

আর দাঁড়ালো না মাধবী। খবর পাঠানোর একটা মানেই হয়। অনেকটা পাত্রী দেখে পরে সংবাদ দেওয়ার সামিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার মনে পড়লো। মামা আর ভাগ্নে দুজনেই দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাধবী নিখোঁজ। এই নিয়ে সারাটা দিন অশান্তি। কান্নাকাটি, মান, অভিমান। বাপ আর মা দুজনে মিলে বুঝিয়েছেন। বুড়ি দিদিমাও চেষ্টা কম করেন নি। দেখতে এলেই তো বিয়ে হ'চ্ছে না। কথা যখন দেওয়া হয়েছে, বাপের মান রাখতেও সামনে গিয়ে একবার বসা উচিত। কিন্তু মাধবীর এক গোঁ। গলায় দড়ি দেবে, তবু ওদের সামনে গিয়ে বসবে না। দুপুরের দিকে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলো, সরকারী উকিল পশুপতি বসাকের বাড়ি। মেজ মেয়ে অমিতা ওর ছেলেবেলার বন্ধু। রাত সাতটা পর্যন্ত হৈ হুল্লোড় করলো সেখানে। গানবাজনায় মেতে রইলো।

সেই শেষ। ডাক্তার গুহ আর আসেন নি। দাবার নেশাতেও নয়। পথেঘাটে অতনু বোসের সঙ্গেও তার দেখা হয় নি।

*   *   *

দিন চারেক। চিঠিটা হাতে ক'রে মাধবী দু'চার মিনিট ভাবলো। ভিতরে কি আছে ওর অজানা নয়। এরকম চিঠি এর

আগেও কয়েকবার পেয়েছে। চিঠি খুলেই কিন্তু মাধবী অবাক। চাকরি হ'য়েছে। দিন ছয়েকের মধ্যে কাজে জয়েন করতে হবে।

মাধবীর মা একগাল হাসলেন। বয়স হয়েছে, চোখে দেখতে পান না ভালো করে। তার ওপর শেষ বয়সটা এভাবে কাটবে কল্পনাও করেন নি। নিজের সব কিছু পিছনে ফেলে কোথাকার সম্পর্কে ভাইঝি-জামাই, তাদের অবলম্বন ক'রে বাঁচা। যতদিন হাতে কিছু ছিলো, তাদের যত্নের সীমা ছিলো না। কিন্তু কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আর কতদিন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা কথা শুরু হয়েছে, ধারালো ইঙ্গিত। চোখ কান বুজিয়ে থাকলেও, ছুরির ফলার মতন গায়ে এসে বেঁধে। অস্থির ক'রে দেয় মানুষকে।

'তখনি তোকে বললুম না মাধবী, অতনু তোকে ঠিক চিনতে পেরেছে!'

'কি জানি চেনার তো কোন লক্ষণ দেখলুম না।' মাধবী আলতো জবাব দিলো। মনে মনে হিসাবটা একবার কষে নিলো। অনেকগুলো ছুটকো-ছাটকা জিনিস কেনার দরকার। কিছু ওর নিজের, কিছুটা মার। এক মাসের মাইনে পেলে হবে না, অন্তত মাস তিনেক ধ'রে কিনতে হবে।

বাঙালী স্টেনো একজন ছিলোই। আশা হালদার। তার আগেই মাধবী মিত্রের চেয়ার পড়লো। অ্যাংলো মেয়ে মিস হ্যানোভারের আলাদা বন্দোবস্ত। খোদ বড় সায়েবের স্টেনো। ইজ্জতই আলাদা। কাজ কম নয়। দশটা থেকে পাঁচটা অফিসের

নিয়ম, কিন্তু হাতের কাজ শেষ ক'রে উঠতে প্রায় ছটা বাজে। প্রথম প্রথম একটা চিঠি ডবল ক'রে টাইপ করতে হয়, হাতের লেখা বুঝে ওঠা যায় না। ডিপার্টমেণ্টে বাবুদের খোশামোদ করতে হয়।

দিন চারেকের মধ্যেই মাধবীর চোখে পড়লো। চোখ দুটো অনেকক্ষণ থেকেই জ্বালা করছিলো: বাথরুমে গিয়ে জল চাপড়ে ফেরবার মুখেই একেবারে সামনাসামনি। অতনু বোস আর আশা হালদার। পাশাপাশিই শুধু নয়, ঘেঁষাঘেঁষিও। অতনু বোসের কি একটা রসিকতায় ঠোঁট বেঁকিয়ে আশা হালদার মুচকি হাসছে। একপাশে সরে এসে মাধবী ওদের পথ ছেড়ে দিলো। অফিস প্রায় খালি। যা দু-একজন ছুটকো-ছাটকা ছিলো এদিক ওদিক, তাদের চোখে মুখেও বিদ্রূপের ছোঁয়াচ। বোঝা গেলো ব্যাপারটা অনেকেরই গা-সওয়া। আনকোরা নতুন কিছু নয়।

এ রকম ব্যাপার পথে ঘাটে মাধবীও কম দেখে নি, অন্য অফিসেও নজরে এসেছে, তবু কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইলো। নতুন কাঁটা বেঁধা? নাকি পুরোনো দিনের ক্ষতটাই আবার চিনচিন ক'রে উঠলো ব্যথায়।

ক্রমে মাধবীর গা-সওয়া হ'য়ে গেলো, অন্তত চোখ-সওয়া। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অতনু বোসই এগিয়ে আসেন। মাধবীকে উপেক্ষা ক'রে আশার দিকে ফিরে দাঁড়ান, 'কই, হ'লো?'

'এই যে এক মিনিট।' আশা হালদার ঘাড়ে গালে আলতো

পাউডারের পাফ বোলাতে বোলাতে উত্তর দেয়। এক মিনিট নয়, মিনিট পাঁচ ছয়ের মধ্যেই তৈরি হ'য়ে নেয়। স্যাচেলটা তুলে নিয়ে মাধবীর দিকে চেয়ে আলতো হেসে উঠে পড়ে চেয়ার থেকে।

মাঝে মাঝে নয়, এ প্রায় রোজকার ব্যাপার।

টাইপ করতে করতে মাধবী মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখে আশা হালদারের দিকে। বয়সে মাধবীর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়ই হবে। চোখ মুখের ছিরিও এমন কিছু আহা-মরি নয়। রং কালো, প্রসাধনের দাপটে একটু হয় তো ফ্যাকাসে হয়েছে। ছোট্ট গোল আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখে। তুলনামূলক যাচাই। পছন্দের হেরফের। আশা হালদারের পাশে মাধবী মিত্র! বালির ফ্রেমে বাঁধা সুবর্ণরেখার পাশে উত্তাল পদ্মা। নেই নেই করেও মাধবীর এখনও যথেষ্ট সৌন্দর্য। অভাবের পলিমাটি পড়ে স্রোত তেমন দুর্বার হয়তো নয়, কিন্তু তবু কূলভাঙার শক্তি এখনও রাখে বৈকি!

মাস ছয়েক। কোম্পানীর আশাতীত লাভ হওয়ায় মোটা রকমের মাইনে বাড়লো দু একজনের। টাইপিস্ট মহলে এক মাধবী ছাড়া আর সকলেরই বাড়লো। নিজেকে আশ্বাস দিয়েছিলো মাধবী, নতুন চাকরি ব'লেই বোধ হয় লিস্ট থেকে সে বাদ। কিন্তু সে ভুলও ভাঙলো। গোকুল সরকার, মাত্র মাস তিনেকের চাকরি, পাঁচ টাকা তারও বেড়েছে।

মাইনে না বাড়তে মাধবীর একটু দুঃখই হ'য়েছিলো, কিন্তু দুঃখ আরো বাড়লো সহানুভূতির ঠ্যালায়। অফিসসুদ্ধ প্রায় সবাই ভেঙে পড়লো ওর মেশিনের দু' পাশে। তালুতে জিভ ঠেকিয়ে নানারকম শব্দ করলো। হরেক রকমের ফন্দিফিকির। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো সোজা বোস সায়েবের সঙ্গে দেখা করার। মাধবী চুপচাপ শুনে গেলো।

বছর কাবার হতে আর একবার মাইনে বাড়ার পালা। এ সময়ে প্রায় সবাইয়েরই বাড়ে। নিদেনপক্ষে পাঁচ টাকা। মাধবীর বরাত। ওর বাড়লো দু' টাকা। এর চেয়ে কিছু না বাড়াই যেন ছিলো ভালো। এ যেন স্কুলে কনসোলেশন প্রাইজ পাওয়ার মত। কেমন একটা পিঠ-চাপড়ানোর ভাব।

এ সব ব্যাপার অতনু বোসের খাস তাঁবে। ওর কথার ওপর বড়কর্তারা আর কলম চালান না। রদবদল করতে হলে বোস সায়েবই করেন।

সেদিন অফিসের পরে মাধবী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো। সুযোগ-সুবিধা পেলে একবার অতনুর সঙ্গে দেখা করবে। দরকার হ'লে পুরোনো আলাপ ঝালিয়ে নেবে, অবশ্য অপ্রিয় প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। কিন্তু ফাঁকই পেলো না। চেম্বারে বসে আশা হালদার। দু-তিনবার কাচের মধ্য দিয়ে মাধবী উঁকি দিলো। চেয়ারের হাতলে হাত চাপড়ে অতনু বোস চীৎকার করে হাসছেন, সঙ্গে সঙ্গে আশাও হাসছে টেবিলে মাথা লুটিয়ে দিয়ে। এ হাসি যে সহজে থামবে এমন মনে হ'লো না। মাথা নিচু ক'রে মাধবী

নিজের চেয়ারে ফিরে এলো।

মাইনে বাড়ার কথাটা বাড়িতেও জানাজানি হ'য়েছিল। বাড়ি বলতে অবশ্য বুড়ি মা। তিনি প্রায়ই খোঁজ নিতেন। অতনু খোঁজখবর নেয় কি না, বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করে কিনা। গোপীপুরের কথা।

মাধবী বিশেষ আমল দেয় নি কথাগুলোয়। আমল দিলে অনেক কথা বলতে হয়। অতনু বোস যে চিনতেই পারে না সেদিনের ডেপুটি মিত্তিরের মেয়েকে এই অপ্রিয় সত্যটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এতদিনে যেন একটু একটু মনে হ'চ্ছে মাধবীর। বোধ হয় চিনতে পেরেছে অতনু। শুধু মেয়েটাকেই মনে পড়ে নি, মেয়েকে ঘিরে পুরনো সব কথাও মনে পড়েছে। আগ্রহ দিয়ে নয়, তাই উপেক্ষা দিয়ে প্রমাণ করছে পুরনো পরিচয়ের ব্যাপার।

বাড়তি মাইনে দু' টাকা শুনে মাধবীর মা মাথায় হাত চাপড়ালেন। আজই না হয় অবস্থার ফেরে এই হয়েছে, কিন্তু বরাবরের ডেপুটি গিন্নী। টাকাপয়সা নাড়াচাড়া কম করেন নি।

'সে কি রে, দু' টাকা মাত্র বাড়লো?' চোখ কুঁচকে বুড়ি মাধবীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মেয়েকে। দু'টাকা বাড়ার জন্য মেয়েই যেন দায়ী। 'তোর অতনু-দার সঙ্গে গিয়ে একটু আলাপও তো করতে পারিস মা। এখন কি আমাদের অভিমান ক'রে সরে থাকবার সময়? অতনু তো এক সময়ে তোকে ভালো চোখেই দেখতো।'

একটি কথারও মাধবী উত্তর দিলো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। আশ্চর্য. ঠিক বুঝতে পেরেছেন মা। মেয়ে যে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করে নি অতনুর সঙ্গে, মামার প্রসঙ্গ তুলে মরচে-ধরা পরিচয়ের খিলেনে পালিশ দেবার চেষ্টা করে নি, সবই বুড়ির চোখে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু মাধবী যে কেন এগিয়ে যায় নি তা যদি বোঝাতে পারতো মাকে। অতনু বোসের আজকের নিস্পৃহ দৃষ্টির তাৎপর্য যদি নিজেই সে বুঝতো।

সুযোগ একটা জুটে গেলো। আশা হালদার সাত দিনের ছুটি নিলো। দূর সম্পর্কের কোন্ বোনের বিয়ে। ভাগলপুর না পুরুলিয়া। মাধবী মরীয়া। যেমন ক'রে হোক এব মধ্যে দেখা করতে হবে অতনুর সঙ্গে। দরকার হ'বে একটু গায়েপড়া ভাব। চিঠির ব্যাপারটা অতনুই তুলবে না সাহস ক'বে, কাজেই অসুবিধা কিছু নেই। আশা হালদাবের চেয়ে কিসে কম মাধবী মিত্র। শর্টহ্যাণ্ড না হয় জানে না ভালো, কিন্তু মনের কথা তুলে নিতে লং হ্যাণ্ডেই বা অসুবিধা কিসের।

সেদিন মাধবী একটু যত্ন ক'রেই সাজলো। বাক্স হাঁটকে জড়ি পাড় ফিনফিনে শাড়ি, হালকা প্রসাধন, চোখের কোণে সযত্ন সুর্মারেখা। সাবান দিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুললো চুলের গোছা। নকল মুক্তার মালাটা ফর্সা গলায় ঠেকালো। কানে আইভরিব রিং। সাদা নখ রূপান্তবিত হলো রক্ত-রাঙায়। হালে কেনা শৌখিন চপ্পল পায়ে আটকালো। আয়নায় অনেক-

ক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো নিজেকে। পুরনো দিনের মাধবীই ফিরে এসেছে। বয়স যেটুকু হরণ করেছে, প্রসাধন ফিরিয়ে দিয়েছে সেটুকু। আফসোসের কিছু নেই।

অফিসে বসে বসে মাধবী অনেক ভাবলো। অতনু বোসকে ঘায়েল করা আর এমন কি শক্ত কথা। সেদিন মামাভাগ্নে যার অপেক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে গিয়েছিলো, সে আজ নিজেই ফিরে এসেছে। আশা করেছিলো, মিস্ হালদার যখন নেই তখন বেশীক্ষণ হয়তো থাকবে না অতনু, পাঁচটার মধ্যে চেম্বার ছাড়বে। কিন্তু সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে মাধবী ক্লান্ত হ'য়ে উঠলো। চেম্বারে একা নয় অতনু, বিল ডিপার্টমেণ্টের জন তিনেক রয়েছে। জরুরী আলোচনা। টাইপ করা চিঠি আবার টাইপ করতে বসলো মাধবী। সময় কাটানোর ছল। তারপর হঠাৎ এক ফন্দী মাথায় এলো।

মেশিন বন্ধ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলো। গেটের কাছেই অতনু বোসের মোটর। কুচকুচে কালো হিলম্যান। লনের কাছ বরাবর মাধবী অপেক্ষা করলো। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, বিশ মিনিট। পায়চারি করে পায়ের শিরা ঝিমঝিম করতে লাগল। শাড়ি সামলে মাধবী লনের ওপরই বসে পড়লো।

মিনিট ছুয়েক। অতনু বোসের চেম্বারের বাতি নিভলো। বেয়ারা স্যুটকেশ নিয়ে মোটরে বেখে উঠে গেলো ওপরে। তারপর ভারী জুতোর শব্দ। মাধবী উঠে সিঁড়ির পাশে গিয়ে

দাঁড়ালো।

ধাপ চারেক নেমেই অতনু বোস থেমে গেলেন। পকেট হাতড়ে কেস বের করে সিগারেট তুলে নিলেন ঠোঁটের ফাঁকে। বারদুয়েক বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশলাই জ্বললো। ফিকে লালচে আলো। সেইটুকু আলোতেই দেখা গেলো অতনুর চ্যাপ্টা নাকের খানিকটা, ঝুলে পড়া মাংস-থলথল গাল। গা ঘিন ঘিন ক'রে ওঠে মাধবীর, কিন্তু দেহ তো নশ্বর। কি তার দাম। রূপের মাপকাঠিতে তার নিরিখ করা হাস্যকর বই কি। এ অফিসে অতনু বোস ক্ষমতার প্রতীক। তার কলমের খোঁচায় মানুষের ওঠানামা হয়, বাড়তি রূপোর চাকতি হাতের মুঠোয় আসে। এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতে অসুবিধা কোথায়? পরাজয়ের গ্লানি প্রতিষ্ঠিত মানুষের মনে থাকার কথা নয়!

সিঁড়ির চাতাল বরাবর অতনু নামতেই মাধবী কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। সেদিন অতনু যতখানি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো তার চেয়েও বেশী কাছে।

একেবারে আচমকা। সিগারেট সরিয়ে অতনু বোস বলে উঠলেন, 'কে?'

'আমি, অতনু দা।' বুকের সমস্ত মধু মাধবী গলার স্বরে উজাড় করে দিলো। অন্ধকার নয়। কোথাও সামান্য ছায়ার আঁচড়ও নেই। মুখটা মাধবী অতনুর দিকে পরিপূর্ণ ভাবেই তুলে ধরেছিলো।

'ওঃ, মিস মিত্র।' সিগারেটে অতনু আবার টান দিলেন।

খুব অল্প ধোঁয়া। আজ আর রিং নয়, স্তবক। পেঁজা তুলোর মতন।

'না, মাধবী। গোপীপুরের।' মাধবী আরো কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালো।

'কি ব্যাপার ?' কুতকুতে এক জোড়া চোখ। পরিচিতির কোন চিহ্ন নেই।

'চিনতে পারলেন না আমাকে ?' মাধবীর গলায় ডুবন্ত মানুষের অসহায় কাকুতি।

'পেরেছি বই কি। আপনাদের চিনতে দু' নজরের দরকার হয় না। তাই বলছি, কি ব্যাপার।' খাদে নামানো গলা। কান খাড়া করে তবে শুনতে হয়।

একটু দমে গেলো মাধবী। দু' এক মিনিট। তারপরই ঠিক ক'রে নিলো নিজেকে। আজ এসপার নয় ওসপার! সুযোগ মানুষের জীবনে বারবার আসে না। সান্নিধ্য চাই মানুষটার। যৌবনতপ্ত দেহের ছোঁয়াচ। সেই তাপে মনের মেঘ গলে যাবে আস্তে আস্তে। শুরু হবে দাক্ষিণ্যের ধারাবর্ষণ।

সুর পাল্টালো মাধবী, 'শরীরটা একটু খারাপ লাগছে, আপনার গাড়িতে যদি একটু লিফট দেন।'

অতনু বোস একবার মাধবীর আপাদমস্তক দেখলেন। চকচকে চপ্পল থেকে পাফ করা চুলের বাহার। আস্তে আস্তে এগিয়ে মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এতক্ষণে মুচকি হাসলো মাধবী। আর ভয় নেই। অতনু

বোস করায়ত্ত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কথা বলার সুযোগ হয় নি, সে সুযোগ হবে পাশাপাশি ব'সে।

মাধবী এগিয়ে মোটরের কাছবরাবর যেতেই অতনু বোস ঘুরে দাঁড়ালেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে একটা দশ টাকার নোট বের করে মাধবীর দিকে প্রসারিত ক'রে দিলেন, 'নিন, একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যান।'

দরজা বন্ধ করার শব্দে নয়, মোটরের গর্জনেও নয়, মাধবীর জ্ঞান হ'লো পিছনের সিঁড়িতে সম্মিলিত পায়ের আওয়াজে। বাকী কেরানির দল অফিস ছাড়ছে এইবার। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না।

চোখ তুলেই দেখলো সামনের লম্বা ঘাসের শীষের মাঝখানে আটকে দশ টাকার নোটটা কাঁপছে থরথর করে। সেদিনের অতনুর ছুঁড়ে দেওয়া চিঠিটার মতনই। সেদিন কিন্তু সে চিঠির ভাষা সবটা জানা ছিলো না। কিছুটা কৌতূহল মেশানো ছিলো, কিছুটা উপেক্ষা। তাই ইতস্তত করেও মাধবী কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়েছিলো আজ কিন্তু এ কাগজের ভাষা জলের মতন তরল, কোথাও রহস্যের ইশারাটুকুও নেই, কৌতূহলের মিটমিটে দীপ্তিও নয়।

তবু এদিক ওদিক চেয়ে মাধবী কাগজের টুকরোটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলো। সহকর্মীদের চোখ বাঁচিয়ে।

বেঁটে ছাতা কিন্তু প্রতাপ কম নয়। ফুট দুয়েক উঠলো মাটি থেকে, দেহের সমান্তরালভাবে। ব্যস্ তাতেই কাজ হলো। অতো বড়ো ডবল ডেকার ব্রেকের শাসনে অচল। বাস অচল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমরা, বাসের যাত্রীরা, সচল হয়ে উঠলাম। বাজারের থলি হাতে জাঁদরেল ভদ্রলোকটি আমায় জাপটে ধরলেন, পাশ থেকে আধ মণ ওজনের একটি গোড়ালি চেপে বসলো পায়ের পাতায়, আমি প্রাণপণে রড আঁকড়ে ধরা সত্ত্বেও এদিকের মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় ছুঁই ছুঁই ভাব। বিরক্তির একটা ঢেউ, চাপা আক্রোশ—কিছুটা ড্রাইভারের ওপর, কিছুটা ঈশ্বরের প্রতি। কিন্তু দোষ দু'জনের কারুরই নয়।

যার দোষ সে ততক্ষণে পাদানিতে উঠে পড়েছে।

'একটু রাস্তা দেবেন' মিহি সুর।

সুর থামতে পেলো না, সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের ভদ্রলোকেরা ধুয়ো ধরলেন, 'দাদা, পাশ দেবেন একটু।'

'মেয়েছেলেকে এগিয়ে যেতে দিন।'

'যান, চলে যান, ভেতরে জায়গা আছে।'

আশ্বাস আর সহানুভূতির অন্ত নেই। কাত হয়ে, পাশ ফিরে, সামনে ঝুঁকে নানাভাবে মেয়েটিকে এগোতে দেওয়ার প্রয়াস চললো।

বাসের মধ্যে আবার মাখো মাখো ভাব। মানুষে মানুষে জাপটা-জাপটি, কাঁধ ঘষাঘষি কতকটা। গিয়ারের মোচড়ে আর একসিলেটরের চাপে বাসের সর্বাঙ্গে ঝাঁকানি। আমাদেরও রড আঁকড়ে ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টা।

তাল সামলে ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েই বেতাল হয়ে গেলাম। কাঁধ ফাটা পাঞ্জাবী আর আধ ময়লা ধুতির পাশাপাশি দামী সিল্কের আকাশরঙা শাড়ী, গোধূলির রঙ ছোঁয়ানো ব্লাউজ, বেঁটে ছাতা কিন্তু উদ্ধত নয়, এবার আড়াআড়িভাবে বেড়ার কাজ করছে। গুমোট গরম, হাওয়া একেবারে নেই। কিন্তু কিছু বলা যায় না। ফুর ফুর করে হাওয়া একটু বইলেই হলো। এক হাতে রড চেপে ধরে আর এক হাতে চাপলাম ধুতির প্রান্ত-ভাগ। উড়ে না সিল্কের শাড়ীতে গিয়ে ঠেকে।

ব্যাস সজোরে একটা বাঁক ঘুরতেই ভেতরে আবার ওলট-পালট অবস্থা। রডের বারণ মানলো না, এ পাশের লোক ওপাশে ছিটকে পড়লো। মেয়েটি বহুকষ্টে সামলালো নিজেকে। নিজে সামলালো বটে, কিন্তু আমার বেসামাল অবস্থা। ছাতিটা আমার পাঁজরে ঠেকানো। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি হলে হয়তো ভেল্কি লেগে যেতো, কিন্তু এ ঠেকাঠেকি হাড়ে আর কাঠে।

চোখ কান বুজিয়ে হাত দিয়ে ঠেলে দিলাম ছাতিটা, 'মাপ করবেন, বড্ড লাগছে।'

'ও সরি' মেয়েটি ছাতিটা সরিয়ে নিলো, রিমলেস চশমার ফাঁক দিয়ে একবার নজর বুলিয়ে নিলো আমার দিকে। ছাতির

বাঁট হাড় স্পর্শ করেছিলো শুধু, চাউনি অস্থিমজ্জা ত্বক ভেদ করলো।

আশ্চর্য, মেয়েটি বাইরে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই আবার চোখ ফেরালো আমার দিকে। লেডিজ সীট কানায় কানায় পূর্ণ, সামনের ভদ্রলোকেরাও নির্বিকার, উঠে আসন ছেড়ে দেবার নামগন্ধ নেই। একেবারে সামনের লোকটি নিমীলিত নেত্র। কপটনিদ্রা কিনা কপটনিদ্রা-বিশারদ মাধবই বলতে পারেন।

কিন্তু কাহিল হলাম আমি। কপাল ভীড়ের চাপে আগেই ঘেমেছিলো এবার মেয়েটির চাউনির বহর দেখে ঘাড়, গলা আর কানের পাশ ঘেমে উঠলো।

চোখের বিদ্যুৎ বড়ো জোর মিনিট খানেক, তার পরেই বজ্রাঘাত। বিনা মেঘে।

'কে বাদলদা?' বাসের গর্জন ছাপিয়ে মেয়েটির গলা শোনা গেলো।

বাধ্য হয়েই ফিরে চাইতে হলো। অন্নপ্রাশনের নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দিয়ে থাকা চলে না, কিন্তু রুজ, পাউডার, স্নোর স্তর পার হয়ে আসল মানুষটার হদিস পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ, হার্পার কোম্পানীর চুরাশী টাকা মাইনের ফাইল-ক্লার্কের নয়।

ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে মনের মধ্যে ডুবুরি নামিয়ে দিলাম। স্মৃতির শুক্তি নাই উঠুক, জল তো ঘোলা করুক একটু। স্থির জলে ছোট ছোট ঢেউ তুলুক—তাতেই হবে।

'বারে, চিনতে পারলে না ?' বাইরের রোদে কনভেক্স লেন্স আগুন ছড়ালো। চিনতে না পারার অপরাধে আঁকা ভুরু বাঁকা হয়ে এলো, ভাঁজ পড়লো গালে।

'স্কটিশ চার্চ কলেজ, হেমলতা বোর্ডিং, মনে পড়েছে ?' মেয়েটি দাঁড়ের ঘায়ে যেন উপকূলের দিকে নৌকা এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো, 'বালিগঞ্জ স্টেশন।'

ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। এক গাল হেসে বললাম, 'ডলি ? ডলি সেন ?'

'বলিহারি স্মরণশক্তি তোমার। কোনদিন নিজের নামই ভুলে যাবে।'

ঠিক কথা বলেছে ডলি। সম্পর্কটা এক সময়ে এই রকমই ছিলো। একজনকে ভোলা মানে আর একজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

কিন্তু কতদিন আগের কথা! বড়ো জোর বছর পাঁচেক। কলেজই তো ছেড়েছি মাত্র চার বছর। এক বছর পুরো বেকারি। ট্রাম ভাড়া আর হাফসোলের খরচেই কষ্টে জমানো টাকার অর্ধেক কাবার। তারপর বহু কষ্টে মেসোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো, বত্রিশ বছরের চেয়ার ছাড়বার প্রায় মুখে। যোগা-যোগ—তিনি ছাড়লেন আর আমি বসলাম—অবশ্য এক চেয়ারে নয়, তাহলে আর বকেয়া সেলাই পড়ে পাঞ্জাবীটায় না ধুতিতে দু' হাত অন্তর গিঁট ? মেসোর সুপারিশে ফাইলের তদ্বিরে লেগে গেলাম। একটানা অফিস করছি সেই থেকে—রড অবলম্বন

করে, কি যাওয়ার পথে—কি ফেরার মুখে। কিন্তু ডলি সেন। আশ্চর্য কোনদিন তার শাড়ীর আঁচলও তো চোখে পড়ে নি, মানুষটা তো দূরের কথা।

কিন্তু দোষ আমার নয়। ডলি সেন অনেক বদলেছে। পুরোনো দিনের সে কাঠামোই নেই। সেদিনের গোলগাল আলুর প্যাটার্ণের মেয়েটা বাড়তি মাংস ঝরিয়ে শুকনো খটখটে হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোয়াল ওঠা গালে, চিবুকে, কপালে রঙের কারসাজি। সবটাই ধাব করা।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। ডলি সেনকে চেনাব খেয়ালে মত্ত ছিলাম, এখন আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম, সকলের দর্শনীয় হয়ে উঠেছি। ডলি সেন ততটা নয়, যতটা আমি।

'এতদিন ছিলে কোথায়, দেখি নি তো?' অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা কবলাম।

'এখানেই তো রয়েছি, বছর তিনেকের ওপর। তবে ট্রামে বাসে খুব বেশী যাতায়াত করি না।' ডলি সেন গলাটা চড়ালো।

মনে মনে চটপট হিসাবটা করে নিলাম। ট্রামে বাসে নয়তো কিসে যাতায়াত করতো ডলি সেন? প্রাকচাকরী-জীবনে আমার সম্বল ছিলো তুটি পা। ট্রাম বাস আমিও কম ব্যবহাব করতাম। কিন্তু ডলি সেনের অবস্থা যে সে পর্যায়ে নামে নি তার চিহ্ন তো ওর সর্বাঙ্গে। এসব মেয়ের ট্রামে বাসে ওঠা স্রেফ শখ। জনতার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির সুযোগ লাভ শুধু। নির্জন নিস্তব্ধতা থেকে কোলাহল আর কলরবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া।

'তারপর কি করছো আজকাল?' ডলি সেন ছাতাটা হাত বদল করলো, 'চাকরি নিশ্চয়!'

করেখা না দেখেও একথা বলতে পারার মধ্যে কৃতিত্ব ছিলো না। এক বছরেই কুলীন কেরাণী হয়ে উঠেছি। মুখের রেখায় বনিয়াদী দাসত্বের ছাপ। চালচলনে পর্যন্ত।

'তুমি?' কথাটা আচমকা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো। আমার হয়ে পাশের দুজন ভদ্রলোক জিভ কাটলেন। হা-হুতাশও করলেন কে একজন। জিভ তালুতে আলতো ছুঁইয়ে চাটনি টাকনা দেবার আওয়াজ।

'পি, এ—ভারতজ্যোতি ইনসিওরেন্সের' ইংরেজী বলছে ডলি সেন এমনিভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

ভারতজ্যোতি ইন্সিওরেন্স! একটুও ভাবতে হলো না, ভাববার উপায়ই রাখে নি মালিকেরা। চৌরাস্তার ওপর রি-রো-কংক্রিটের ছতলা বাড়ী। জ্বলছে কোম্পানীর নাম, দিনে—রূপোলী অক্ষরে, রাত্রে—নিওনের প্রবালরঙা আলোর মালায়। সোজা রাস্তা হলে মাইল খানেক দূর থেকে নজরে পড়ে। এদেশের জাঁদরেল লোকেদের নাম কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের পাতায়। উপাধির জ্বালা যত কম, টাকার মালা সেই অনুপাতে বেশী। তাছাড়া শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে নানা প্রদেশের মাটির গভীরে শেকড় চালিয়েছে। বিরাট মহীরূহ। ছায়া চাও ছায়া, ফল—তাও আছে, নয়তো শুধু ক'লকাতার অফিসেই ছ'শো কেরাণী কি আর এমনি ঘানি ঘোরাচ্ছে!

আমি আড়চোখে আর একবার ডলি সেনের সাজসজ্জার ওপর আলতো চোখ বুলিয়ে নিলাম। আর বেমানান লাগছে না। মেয়ে কেরাণীর তুলনায় প্রসাধন হয়তো একটু উগ্র, কিন্তু ভারতজ্যোতির 'পি এ'র এতো আটপৌরে পোশাক! লাঞ্চের সময় শাড়ীর রং পাল্টায় কিনা কে জানে।

'ভালোই তো আছো তাহ'লে', মুচকি হেসে বললাম।

'তুমিই বা কম ভালো কি', হাত দিয়ে ডলি সেন রিমলেসটা ধাতস্থ করলো, 'অতীত ভুলতে পেরেছো, কম কথা।'

সহযাত্রীদের পক্ষে একটু অতিরিক্ত ডোজ। বর্তমান নিয়ে নাড়াচাড়া অবধি সওয়া যায়, কিন্তু ফেলে আসা দিনের কথা! কলেজী জীবনের নরম রোদ আর ফুরফুরে বাতাস। দু' একজন অর্থবোধক কাশি কাশতে শুরু করলেন। ভাবটা যেন, একটু বুঝে শু া, আমরা বৃদ্ধের দল কিছু কিছু এখনও জীবিত।

কথাটায় মনে একটু ঝাঁকানি লাগলো। তা হ'লে ডলি সেন বুঝি নিজে মনে রেখেছে সে সব দিনের কথা। করিডরে, সবুজ লনে, জনবিরল পার্কে টুকরো টুকরো করে ছড়ানো প্রজাপতির পাখার মতন বহুবিচিত্র সে সব কাহিনী। কে জানতো আজকের এই ঊষর মরুভূমির রুক্ষতা অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু এ রুক্ষতা শুধু আমার নিজের। ডলি সেনের জীবনে সেদিনের সবুজ সবুজতর হ'য়েছে। পান্নার মতন দ্যুতিময়। তাই হয়তো পুরোনো দিনের কথার টুকরো বিস্মৃতির ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে জমা হয় নি।

'আছো কোথায়?' এর পরে এ প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু মনেই এলো না।

উত্তর দেবার আর অবসর পেলো না। শোনবার অবকাশও আমার কম। হর্নের আওয়াজের সঙ্গে তাল দিয়ে ড্রাইভার গালিগালাজ দিয়ে চলেছে। ভাষাটা ঠিক অনুধাবন ক'রতে না পারলেও তার মুখ চোখের চেহারায় যেটুকু মালুম হ'লো তাতেই বুঝলাম কেউ পথরোধ করেছে। বীরের বংশ, রক্তকণিকায় ঝাঁঝের ভাগই বেশী, যে হাতে কৃপাণ ধরতো আজ না হয় স্টিয়ারিং ধরেছে সে হাতে, কিন্তু রোখ যাবে কোথায়।

'কি হ'লো' ডলি সেন চিন্তিত হয়ে উঠলো।

নিচু হ'য়েও ব্যাপারটা বিশেষ কোন হদিস করতে পারলাম না। মানুষের পাঁচিল ভেদ ক'রে কিছু দেখাও সম্ভব নয়। তবে দুঃখের খবর চাপা থাকে না। লোকের মুখে মুখে আঁচ করা গেলো কিছুটা। সামনে কয়লার গাড়ী কাত হ'য়ে প'ড়েছে। টাল খাওয়া চাকাটা গড়িয়ে পড়েছে রাস্তার পাশে। কয়লার চাঙাড়ে রাজপথ ভর্তি। কয়লার বস্তা, সদ্যোমুক্ত চাকা আর বেয়াক্কেলে বলদ দুটোকে আওতায় আনতে গাড়োওয়ালা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এমনি নাজেহাল অবস্থায় অবশ্য ড্রাইভারের গালাগালগুলো শাকের আঁটিরই সামিল। কাত হওয়া গাড়ীর গাড়োয়ানকে আর বেশী কাত করতে পারলো না।

চল্লিশ ফুট রাস্তা তাও ভাগবাঁটরা করা। অর্ধেক ট্রামের, অর্ধেক বাকি আর সবাইয়ের। কাজেই ড্রাইভার একটু বেকায়-

দায় পড়ে গেছে। বাঁ দিকে আর হাত দুয়েক পথ ফাঁকা পেলে একবার কসরতটা দেখাতো। বাসের বাইরে ঝুলে পড়া দু-একজনের ফুটপাথের পাশের লাইট পোস্টের সঙ্গে বোঝাপড়ার সমস্যা একটা ছিলো অবশ্য, কিন্তু অত সব ভাবতে গেলে কলকাতায় বাস চালানো যায় না।

বাঁ হাতটা ডলি সেন নাকের কাছে তুললো। লক্ষ্য করি নি, কব্জিতে চৌকো ঘড়ি প্ল্যাস্টিক বন্ধনে বাঁধা। চোখ ফিরিয়েই আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'সর্বনাশ, আর দশ মিনিট বাকি! খুব জরুরী একটা কাজ রয়েছে ফার্স্ট আওয়ারে। চলি, এখান থেকে ট্যাক্সি না নিলে লেট হয়ে যাবো।'

আবার সেই বেঁটে ছাতার কারসাজি। ভীড়ের মধ্যে পথ ক'রে নেবার আশ্চর্য কৌশলে ব্যবহৃত হ'লো। নামবার মুখে ডলি সেন একবার ঘুরে দাঁড়ালো, 'দেখা করো একদিন বুঝলে?'

আমি বুঝলাম। আশে পাশে দাঁড়ানো সহযাত্রীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তারাও বুঝেছে। বোঝাবুঝির পালায় ওই একটা মস্ত সুবিধা।

কিন্তু মর্ম্মাহত হলাম। ডলি সেনের আচমকা নেমে যাওয়ার জন্য নয়, আমাকে ফেলে যাওয়ার জন্য। অফিস তো আমারও আছে, সেই সঙ্গে লেট হবার সম্ভাবনাও। অবশ্য আমাদের অফিস এমন কিছু পাশাপাশি নয়, কিন্তু একটু এগোনোও তো যেতো।

অফিসের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে কথাটা মনে পড়লো। দেখা

যে করতে বললো ডলি সেন একদিন, কিন্তু কোথায়। বাড়ির ঠিকানা জানবার সুযোগ হলো না। তা ব'লে অফিসে নিশ্চয় নয়। আধময়লা সহস্রছিন্ন পোষাকে বাসের ভীড়ে পাশাপাশি দাঁড়ানো চলে কিন্তু অফিসে সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ানো উচিত কখনও! ঝকঝকে তকতকে কেতাদুরস্ত ব্যাপার সেখানে, কলিং বেলের ছন্দের সঙ্গে বেয়ারা পিয়নদের হুড়োহুড়ি, পাত্তাই দেবে না হয়তো। চাকরীর উমেদার ভেবে দাঁড় করিয়েই রাখবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! সে হয় না।

অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরো কয়েকবার মনে পড়লো ডলি সেনের কথা। ফাইলের পাতায় মেঘ-নীল শাড়ীর আবছা ছায়া। টেবিলের কোণে সরে সরে আসা রোদের হিজি বিজি আঁচড়ে রিমলেসের চকমকানি।

পাশে বসা তারানাথবাবু ঝুঁকে পড়লেন, 'ব্রাদার কি পোয়েট্রি ভাঁজছো?'

'পোয়েট্রি আমার বাপের জন্মে আসে না।'

'বাপের জন্মে তো অনেক কিছুই আসে নি। কিন্তু তোমার রকম সকমটা সুবিধের ঠেকছে না। সামনে ফাইল খোলা, গালে হাত, হার্পার কোম্পানীর ফাইল ডিপার্টমেণ্টে যেন নেই ব'লে হ'চ্ছে।'

ফাইলটা বন্ধ ক'রে সোজা হ'য়ে বসলাম। চেয়ারে পিঠ রেখে।

আজ যেমন আচমকা দেখা হ'য়ে গেলো ডলি সেনের সঙ্গে

সেদিনের দেখাটা কিন্তু এত আচমকা নয়। কলেজে যাওয়া আসার ফাঁকে অনেকদিন দেখেছি। দলের মধ্যেও যেন দল ছাড়া। ঝকমকে পোষাক স্নো পাউডার সবই ছিলো কিন্তু আজকের মতন এমন উগ্র নয়। দেখা কলেজের করিডরে হ'লেও আলাপ হ'য়েছিলো অন্য জায়গায়।

পিসতুতো বোনের বিয়ে। কোমরে তোয়ালে বেঁধে দৌড়া-দৌড়ি করছি। কাজের বাড়িতে ওটা করাই সুবিধা, নয়তো থামলেই সত্যি সত্যি আসল কাজ কেউ ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।

কপালের ঘামটা মোছবার মুখেই বৌদির সঙ্গে দেখা, দেড়তলার চাতালে।

'আরে ঠাকুরপো, তোমাকেই যে খুঁজছি।'

ব্যাপারটা আঁচ করলাম। শেষ মুহূর্তে কি একটা এসে পৌঁছোয় নি, তার তদারকে ছুটতে হবে। নয়তো রগচটা কোন আত্মীয় নিমন্ত্রণের ত্রুটিতে বসে আছেন পায়ের ওপর পা তুলে, তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আনতে হবে টেনে। দুটো কাজই সমান বিরক্তিকর। তাই ভুরু দুটো কুঁচকে বললাম, 'এখন মরবার সময় নেই বৌদি। বরযাত্রীরা সবে খেতে বসেছে। তাদের কি চাই না চাই দেখতে হবে না?'

তাদের কি চাই না চাই সেটা বৌদি জানা প্রয়োজন মনে করলেন না মোটেই, আমি কি চাই সেটা বুঝি তাঁর অজানা ছিলো না। মুচকি হেসে বললেন, 'খালি লুচির ধামাটা নিয়ে অত ছুটোছুটি আর নাই করলে ঠাকুরপো, ওটা নিচে রেখে এ ঘরে

এসো, ডলি তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য বসে রয়েছে।'

'কে ডলি', মুখ বেঁকালাম বটে, কিন্তু লুচির খালি ধামাটা ততক্ষণ সিঁড়ির কোণে রেখে দিয়েছি। তোয়ালে দিয়ে রগড়ে লালচে করে ফেলেছি মুখটা। হাতের কাছে চিরুণী একটা পেলে চুলগুলোকে একটু দুরস্ত করে নেওয়া যেতো, কিন্তু সে কথা বলিই বা কাকে!

'ডলি সেন গো তোমাদের কলেজের, যার নামে ছেলেরা মুচ্ছো যায়', বৌদিব হাসি আব থামতেই চায় না।

আশ্চর্য, কোঁচকানো মুখ মুহূর্তে ঠিক হ'য়ে গেলো। হাত দিয়ে আলতো চুলগুলো ঠিক করে নিলাম। হাঁটুর নিচে নামিয়ে দিলাম ধুতি। মেয়েটা আবার ফিটফাট, একটু এদিক ওদিক দেখলে মুখই ফিরিয়ে নেবে হয়তো।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু থতমত খেয়ে গেলাম। এ সম্ভাবনার কথাটুকু ভাবি নি। ডলি সেন তো আছেই কিন্তু সারা ঘরে যে গিজগিজ করেছে মেয়ের পাল। রংয়ের দোকানকেও হার মানিয়েছে আর মুনিয়া পাখীর মতন অনর্গল কিচির মিচির শব্দ। শোনার বালাই নেই কেবল বলা।

বৌদি আমাকে নিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়াতেই সব নিঃঝুম। মানুষ নেই, যেন রাশি রাশি কফিন। নড়াচড়াও ভুলে গেলো সবাই। 'এই বাদল, আমার দেওর' বৌদি ঠেলে দিলেন আমাকে। পরিচয়ের ছিরিতে ঘাবড়ে গেলাম। অবশ্য এই মুহূর্তে বৌদির দেওর ছাড়া অন্য পরিচয়পত্রে আমার দরকার নেই।

আর কাজেও লাগতো না আর কিছু।

আমি হাত জোড় করার আগেই ডলি সেন হাত জোড় করলো। অন্য মেয়েরা ফুটন্ত খইয়ের মতন ছড়িয়ে ছিটকে পড়লো চারদিকে। ব্যূহ প্রবেশের আব কোন বাধা রইলো না। একটু দেরী হলো। হাডুডু খেলার মতন কে আগে কার এলাকায় পা দেবে তাই নিয়ে সামান্য সমস্যা, কিন্তু ডলি সেনই এগিয়ে এলো।

'উপহারের বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে আপনার নাম পেলাম, অবশ্য তলায় কলেজের নামটা লেখা না থাকলে অন্য কোন আকাশের বাদল ব'লেই ধরে নিতাম।'

ডলি সেন থামার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘামতে শুরু করলাম। চেহারার চটকের চেয়ে কথার চটকও কম নয়।

'ডলি আবার সম্পর্কে আমাব বোনঝি হয় জানো ঠাকুরপো।' বৌদি আলগোছা ছুঁড়ে দিলেন কথাগুলো।

'তাই নাকি', এক গ্লাস জল পেলে হ'তো ধারে কাছে। জিভটা কেবলই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে আর অস্পষ্ট হয়ে আসছে গলার আওয়াজ।

'আপনার তো থার্ড ইয়ার?' ডলি সেন এগিয়ে একেবারে পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো। খুব মিষ্টি একটা গন্ধ, চুল থেকে না কাপড় থেকে কে জানে, কিন্তু মোলায়েম সুবাস। তোয়ালে দিয়ে আবার ঘাড়ের ঘাম মুছলাম তারপর বললাম, 'না, ফোর্থ ইয়ার।'

'বলেন কি ? এত অল্প বয়সে ?'

পিছনে হাসির রোল উঠলো। চুড়ির ঝঙ্কারও। রসিকতাটা সবাই উপভোগ করলো এমন একটা ভাব।

'আমার সেকেণ্ড ইয়ার। পড়াশোনা যা করছি মুখ থুবড়ে কতদিন পড়ে থাকতে হবে এখানে ঠিক আছে', ডলি সেন কথার ফাঁকে শাড়ীর পাট ঠিক করে নিলো, মাথার কাঁটার ওপর হাত বোলালো তারপর বিনা কারণেই ফিক ক'রে হাসলো।

এরপর কি বলা যায় ভাবতে গিয়েই বাধা পেলাম। পিস-তুতো দাদা ওপর থেকে নিচে নামছিলেন। একেবারে হন্তদন্ত হয়ে। ব্যস্তবাগীশ লোক। নিজে যেদিকটা না দেখবেন সেদিকটাই পণ্ড হবে এমন একটা ধারণা। আজ বলে নয় চিরটাকাল।

'ওরে কে আছিস', হাঁকটা বোধ হয় আমাকে দেখেই।

আমিই ছিলাম এবং বিশ্রী অবস্থায়। আড়চোখে আমার দিকে চাইতেই আমি সরে দাঁড়ালাম, 'কিছু বল্লেন ?'

'বলার তো ইচ্ছা ছিলো', এবার দাদা চাইলেন ডলি সেনের দিকে।

'একটু শুনে আসি', বৌদি আর ডলি সেনের মাঝামাঝি চেয়ে হাসবার চেষ্টা করলাম।

শোনা অবশ্য হ'লো কিন্তু শুনে আসা নয়। একেবারে নিচের ঘরে চালান দেওয়া হ'লো আমাকে। নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করার কাজে।

সব চুকতে রাত বারোটা। হাত মুখ ধুয়ে সিঁড়ি দিয়ে

ওপরে উঠতে গিয়েই আবার দেখা। ডলি সেন নামছিলো। সাজপোষাক একই, বাড়তি কেবল পানের রসে লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁট।

এবার আমিই কথা বললাম, 'কি বাসর জাগবেন না?'

'পরের বাসরে আর জেগে লাভ কি?' চটিতে পা গলাতে গলাতে ডলি সেন উত্তর দিলো।

'অভ্যাস ক'রে রাখাই তো ভালো, নয়তো নিজের বাসরে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবে।' আশে পাশে কেউ নেই। একেবারে ফাঁকা। রাতও নিশুতি। এমন জায়গায় সব মানুষেরই সাহস আসে। মুখে কথা জোগায়।

'সেদিন ঘুমে যদি চোখ জড়িয়ে আসে জানবেন সে কপট ঘুম। বাড়তি লোকদের তাড়াবার ফিকির।' কিছু আটকায় না মেয়েটার মুখে। মানুষজন মানে না।

সিঁড়ির এক ধাপ নেমে বললো, দুনিয়া সুদ্ধ লোকের তো কথা শুনে বেড়াচ্ছেন আমার কথা শুনবেন একটা?'

একটা! যুগযুগান্ত ধরে অবিরাম শুনতে পারি কথা। সামান্য ক্লান্তি আসবে না, একটু অবসাদও নয়। কিন্তু কথাটা কি?

'সঙ্গে করে পৌঁছে দেবেন? এত রাত্রে একলা যেতে কেমন লাগছে।' ডলি সেনের গলায় অনুনয়ের ছোঁয়াচ।

'এ আবার একটা কথা, আসুন', সঙ্গে সঙ্গে নামতে আরম্ভ করলাম সিঁড়ি দিয়ে। পিছনে পিছনে ডলি সেন।

কথা বল্লাম মাঝ রাস্তায় এসে।

'কোথায় যাবেন ?'

'হেমলতা বোর্ডিং। চার্চ রো।'

একেবারে অযথা, তবু কেমন কথা বলতে ইচ্ছা করলো, 'বোর্ডিংয়ে থাকেন বুঝি ?'

'উপায় কি ? মেয়ে কলেজে পড়ে ব'লে বাপ তো আর চাকরী ফেলে রংপুর থেকে এখানে এসে বাসা বাঁধতে পারে না।' কথার সঙ্গে ডলি কাছে সরে এলো। মিটমিটে গ্যাসের আলো। অ্যাসফাল্ট মোড়া রাস্তাটা চিকচিকই করছে শুধু, এমন কিছু আলোকিত হচ্ছে না। ঝুঁকে পড়া পাকুড় আর শিরিষের ডাল-গুলো বাতাসে কাঁপছে। নিঃসাড় নিঝুম।

ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারলাম না, 'কি সরে এলেন যে ? ভয় করছে বুঝি ?'

'মেয়েরা কি শুধু ভয়েতেই সরে আসে ?' উত্তর দিতে ডলি সেনের এক মিনিটও দেরী হলো না।

বন্ধুবান্ধবদের মুখে শুনেই এসেছিলাম এতদিন, আজ সংশয় মিটলো। মুখরা, চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, তোয়াক্কা করে না কারুর—সব শুনেছিলাম, কিন্তু নির্জন রাস্তায় গভীর রাত্রে ডলি সেনের মুখরতা অস্বস্তিকর মনে হলো। সাপের মতন তুহিন শীতল স্পর্শ, ছোবলের চেয়ে মারাত্মক।

অনেকক্ষণ কথা হলো না। দুজনের চটির শব্দ। কুকুরের ভয় দেখানো চীৎকার। খুলে রাখা ড্রেনের জলের আওয়াজ।

আর দূর নয়। হেলে পড়া নারকেল গাছের পাশে আঁকা বাঁকা খোয়া ওঠা রাস্তাটাই চার্চ রো। আধ মাইলের মধ্যে চার্চের গন্ধ নেই। হয়তো অনেক আগে মিশনারীদের যুগে ছিলো কিংবা তালপুকুরে ঘটি না ডোবার পুরোনো ইতিকথা।

তা নিয়ে মাথা ঘামালাম না, মাথা ঘামলো অন্য একটা কথা মনে হ'তে, 'তাইতো একটা ভুল হ'য়ে গেলো।'

ডলি সেন শুধু থামলো না, একেবারে ঘুরে দাঁড়ালো, 'কি ?'

'মানে', মাথা চুলকোলাম, 'আসার সময় বৌদিকে বলে এসেছেন আপনি ?'

ডলি সেন মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'আপনার মতলবটা কি বলতে পারেন ? এত দূর এসে আবার উজান বেয়ে আপনার বৌদির কাছে সামাজিকতা রক্ষা করতে হবে নাকি ? পাগল, আসুন, আসুন', চটির শব্দ তুলে ডলি সেন এগিয়ে গেলো।

জোর দু পা, তারপরেই মুখ ফিরিয়ে বললো, 'কি আর হবে, বড়ো জোর ভাববে ডলিকে নিয়ে তার দেওরটি হাওয়া হ'য়েছে।'

আর একটি কথা নয়, কথার চেষ্টাও নয়। খুরে দণ্ডবত অমন মেয়ের। কথা বলাই দায় ! মুখের মধ্যে তো আর জিভ নেই ডলি সেনের, হুল আছে। তাই যদি থাকে, তা বলে নির্বিবাদে নির্বিচারে এমনি ক'রে ফোটাবে মানুষকে !

ঘড়ির আওয়াজে চমক ভাঙলো। পাঁচটা। কি ভাগ্যিস কাজের চাপ কম, ফাইল নেবার তাড়াও নেই বিশেষ, নয়তো দু ঘণ্টা ধরে বসে বসে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে চলেছি, কারুর

নজর পড়ে নি। শুধু কি পুরোনো কথাই, সামনের ব্লটিং প্যাডে বার তিনেক লিখেছি ডলি সেনের নাম। নজর পড়তেই তার ওপর বুলিয়ে বুলিয়ে বড়ো সাহেবের নাম লিখলাম। তাঁর উপাধি আর পদবী। তবু যেন রিমলেসের ঝকমকানির মতন ঝকঝক করে ওঠে মেয়েটার নাম। সব বাধা, সব বিপত্তি ঠেলে।

বাসে উঠেও নেমে এলাম। সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেই বা কি লাভ! সেই তো ঝুপসি অন্ধকার কোটর। গায়ে গায়ে তক্তপোষ। পাশ ফিরতে হ'লে আর একজনের বিছানায় গিয়ে পড়তে হয়। প্রসাদবাবুর একঘেয়ে গড়গড়া টানা, আশুবাবুর গাল বাজিয়ে স্তোত্র পাঠ, মেসের ঠাকুরের হাতল ভাঙা কাপে বিনা দুধে চা তৈরীর কেরামতি, খবরের কাগজ চোখে চাপা দিয়ে চুপচাপ চিৎ—তার চেয়ে কার্জন পার্কে একটু গড়িয়ে নিতে ক্ষতি কি! অতখানি আকাশ, আর যদি চাঁদ ওঠার তারিখ থাকে চাঁদও তো দেখা যাবে, সব কিছু পয়সা দিয়ে পাওয়ার যুগে একটা কম লাভ,—কেরাণীর উপরির চেয়েও লোভনীয়।

তারপরে অনেকবার দেখা হ'য়েছে ডলি সেনের সঙ্গে, আরো ঘন ঘন। ক্লাস করার ফাঁকে, ছুটির পরে, তা ছাড়াও ছলছুতো করে কাছে এসেছি দুজনে। দেহের কাছেই শুধু নয় মনেরও কাছাকাছি। কলেজের ছাত্ররা টিটকিরী শুরু করলো, মুখে মুখে বানানো ছড়া, হেমলতা বোর্ডিংয়ের মেয়েরা বাঁকা চাউনি আর মুচকি হাসি।

মতলবটা ডলি সেনই বের করলো প্রথমে, 'একটা কাজ করবে ?'

'কি ?' গন্ধমাদন আনতে বললে তাই পারি এমনি মনের অবস্থা আমার।

'কাল তো ছুটি, বারোটা নাগাদ থাকবে বালিগঞ্জ স্টেশনে ?'

'বালিগঞ্জ স্টেশনে, হঠাৎ ?'

'থেকো, দরকার আছে।'

থাকবো তো নিশ্চয়, কিন্তু চিন্তায় পড়লাম। এত জায়গা থাকতে স্টেশনে কেন। স্টেশনমাস্টারকে সাক্ষী রেখে মন দেওয়া নেওয়ার পালা চলবে নাকি ?

বারোটার অনেক আগেই পৌছলাম। ডলি সেন এসে পৌছোয় নি। স্টেশনও প্রায় ফাঁকা। দু একটা তরকারিওয়ালা খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরে চলেছে, দুধের বালতি মাথায় কয়েকটা গয়লা। সিগনাল ডাউন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডলি সেন এসে পৌছোলো।

'এই দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন, শীগিগর দুটো টিকেট কিনে আনো।' আমি বুকিং অফিসের দিকে পা বাড়াতেই ডলি বাধা দিলো, 'তুমি দাঁড়াও এখানে, আমিই যাচ্ছি।'

কারণটা বুঝলাম। অবুঝ নয় ডলি সেন। দাদা বউদির রোজগারে থেকে, সন্ধ্যের ঝোঁকে বাড়তি একটা টিউশনি করে বড়ো জোর নিজের জামা কাপড়ের খরচটা মেটানো যায়, মনের মেয়েকে নিয়ে রেল-ভ্রমণের বিলাসিতা সাজে না।

ট্রেন আর ডলি এক সঙ্গেই প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছোলো। ট্রেনে ওঠালো ডলি সেন প্রায় হাত ধ'রে। কামরায় ঢুকেই হকচকিয়ে গেলাম। গদি আঁটা আসন, ডবল পাখা, ঝকঝকে মেঝে!

'এ কি, এ কামরায় উঠলে যে?'

ডলি সেন হাসলো, 'কামরাই দেখছো শুধু, টিকেট দুটো যে সাদা রংয়ের সেদিকে খেয়াল নেই বুঝি?'

শুধু কামরা বদলই নয়, ডলি সেনও বদলালো। ট্রেন ছাড়তেই আমার কোলের ওপর মাথা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো, 'যাক, বাবা, ঘণ্টা দুয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত।'

সত্যিই তাই। ঘণ্টা দুয়েকই শুধু নয়, যাওয়া আসা নিয়ে প্রায় ঘণ্টা পাঁচেকের ব্যাপার। একেবারে নিশ্চিন্ত। দাদার চোখ রাঙানি, বৌদির কথার খোঁচা, কুড়ি টাকা মাইনে দেওয়া ছাত্রের বাপের গা-জল করা হাসি—সমস্ত ম্লান হ'য়ে গেলো। ছোট কামরা তো নয়, ছোট সংসার যেন আমাদের। চাঁদ থাকার কথা নয়, তাই বর্ষার মেঘকে সাক্ষী রেখে আবোল তাবোল প্রতিজ্ঞা, দুনিয়ার সব কিছু উপেক্ষা ক'রে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসার শপথ। সংসার-অনভিজ্ঞ দুটি হৃদয়ের অক্ষম ব্যাকুলতা।

সেদিন ফিরে এসে আর অবশ্য টিউশনিতে যাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু ক্ষোভ ছিলো না। কারণ একদিনের কাটা মাইনের অঙ্কটা অন্যভাবে ডলি পুষিয়ে দিয়েছিলো। জমার ঘরে টান পড়ে নি।

সামনের ঘড়িটার দিকে চেয়েই উঠে দাঁড়ালাম। মেসের ঠাকুর এমন কিছু আপনজন নয় যে রাত অবধি ভাত কোলে করে বসে থাকবে। ওঠা যাক। কিন্তু উঠতে উঠতেও মনে হলো কথাটা। আজকের ডলি সেনের কাছে সে আবোলতাবোলেরও কোন মানেই হয়তো নেই। চুরাশী টাকা সম্বল কেরাণীকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখাটাও ধৃষ্টতা। সেদিনের সাক্ষী রাখা বর্ষার মেঘও ভয়ে পিছিয়ে যাবে।

দিন কুড়ি বোধ হয় কিংবা একটু কমই হবে। সেজো সাহেব কিসের এক হিসেবপত্র খাড়া করার চেষ্টা করছেন, ফলে একাউন্টস ডিপার্টমেণ্ট তো আছেই, আমাকেও সমানে রাত আটটা অবধি হাজিরা দিয়ে যেতে হচ্ছে। এক নাগাড়ে পাঁচ-দিন। সাত সকালে চিবিয়ে আসা চাল কোথায় তলিয়ে গেছে ঠিক আছে! তুপুরে সস্তায় কেনা ঘুঘনিরও অস্তিত্ব নেই, মাঝে মাঝে চোঁয়া ঢেকুর ছাড়া।

ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন আটটা দশ। বরাত ভালো। প্রায় ফাঁকা ট্রাম সামনে। উঠে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে চোখে লাগাবো এই ইচ্ছা কিন্তু বিধি বাদী, শার্টে টান পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'কি ব্যাপার, এত রাত্রে ?'

মুখরোচক একটা উত্তর মনে এসোছলো, কিন্তু সে কথা কোন মেয়েকেই বলা যায় না, ডলি সেনকে তো নয়ই। 'রাত

একটু হ'য়ে গেলো' ঠোঁট কুঁচকে মুখে হাসি হাসি ভাব আনতে গিয়েই মুশকিল হ'লো, সেই ঘুঘনির চোঁয়া ঢেকুর।

'বসো না এখানে', ডলি জানলা ঘেঁষে বসলো। সঙ্কোচ কাটিয়ে পাশেই বসে পড়লাম।

'তোমার এত দেরী ?'

'আমার মাঝে মাঝে হয় এরকম দেরী। কাজের চাপ বেশী পড়ে।' ডলি আঁচলটা গুছিয়ে কাঁধের ওপর রাখলো।

'বেশ লোক তুমি', আমি শুরু করলাম।

'কেন ?'

'সেদিন দেখা করতে বললে অথচ বাড়ির ঠিকানাই দিলে না।'

গাল দুটো লালচে হ'য়ে উঠলো, একটু কাঁপলো বুঝি নিচের ঠোঁট কিন্তু ডলি সেন সামলে নিলো, 'বাড়ির ঠিকানা দিয়েই বা লাভ কি তোমায় ? কতটুকুই বা থাকি বাড়িতে। ছুটির দিনও নিস্তার নেই। সতেরোর দুই অপূর্ব ঘোষাল লেন।'

'বলো কি', একটু বেশী জোরেই চেঁচিয়ে ফেললাম, 'আমার মেস থেকে শুধু একটা ঢিল ছোঁড়ার ওয়াস্তা।'

ডলি মুচকি হাসলো, 'সর্বনাশ, ওসব ছুঁড়ো না যেন, এমনি-তেই পাড়ায় বদনাম আছে।'

'বদনাম !'

'নিশ্চয়, মেয়েছেলে বিয়ে থা ক'রে সংসারী হবে, ঝলমলে পোষাক পরে তার আবার অফিস করা কি। পাড়ার বেকার ছোকরারা ভেবে আকুল।'

কোন উত্তর দিলাম না। ট্রাম জোরে ছুটেছে। হাওয়ায় ডলির কপালের চুলগুলো উড়ছে, মনও হয়তো উড়ু উড়ু।

এ রকম হবার অবশ্য কথা নয়। বি এ পাশ করলেই আশা ছিলো কিছু একটা জুটে যাবে। আজকের এ চাকরীর চেয়ে ভালো জাতের কিছু। অন্ততঃ খড় কুটো দিয়ে বাসা বাঁধা যায়, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচাও যায় যাতে। পরীক্ষার পরে ডলি বাপের কাছে ফিরে গেলো রংপুরে। পাশ করতে পারে নি সে খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু আই এ পাশ করতে পারে নি ব'লে লেখাপড়াই ছেড়ে দেবে একেবারে, পুরোনো কলেজে ফিরেও আসবে না!

সত্যি কথা বলতে কি, ডলি সেনের কথা খুব বেশী করে ভাবতে পারি নি। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দাদা পথ দেখতে বললেন। বৌদি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, পুরুষ মানুষের ব'সে খাওয়ার লজ্জাটুকুর কথা।

পথ দেখলাম কিন্তু সে পথে বড়ো বড়ো অফিসের ছায়া, ডলি সেনের চিহ্নমাত্রও ছিল না। শুধু দরখাস্ত, অনুরোধ, উপরোধ, সুপারিশ, ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলা। প্রথমে অস্পষ্ট তারপর এক সময়ে ডলি সেন নিঃশেষে মিলিয়ে গেলো।

'বিয়ে থা করো নি?' আচমকা ডলির গলার আওয়াজে ভাবনার জট ছিঁড়ে গেলো।

'বিয়ে থা?' হাসলাম, 'মাসান্তে যা পাই তা একটা প্রাণ

বাঁচানোর পক্ষেই প্রাণান্তকর, আবার বাড়তি প্রাণ আমদানীর চেষ্টা।'

'আসল কথা তা নয়,' ডলি সেন হাসলো, 'বাড়িতে তাড়া দেবার কোন লোক নেই কিনা, তাই বেঁচে গেছো।'

আবার পুরোনো কথাগুলো মনের মধ্যে ভীড় করে এলো। কাছের মানুষ পাশাপাশি থেকেও যেন কত দূরে। হাত বাড়িয়ে হাতটুকু ছোঁয়ার অধিকারও আজ নেই, মন তো দূরের কথা।

সেদিন যত না বাধা ছিলো, আজকের বাধা অনেক বেশী। প্রধান বাধা মাইনের অঙ্কটা, ডলি সেনের ঝলমলে পোষাকও কম বাধা নয়।

উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ডলি সেনও উঠে দাঁড়ালো।

'একি তুমি উঠলে এখানে, তোমার তো আরও দু স্টপেজ বাকি?'

'তোমার সঙ্গেই নামি। এক সঙ্গে কিছুটা রাস্তা যাওয়া যাবে।'

আপত্তি করলাম না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আর এক রাতের পাশাপাশি হাঁটার কথা মনে পড়লো। আজকের পথ অত জনবিরল নয়। মানুষের চাউনির ভয় আছে। কিন্তু আসল মানুষটার চাউনিই গেছে বদলে।

'আচ্ছা, তুমি যাও, আমি একটা কাজ সেরে আসি।' মাটিতে ছাতার ঠোক্কর দিয়ে ডলি সেন থেমে গেলো।

'এখানে কোথায় কাজ?' এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখলাম।

সামনে ছোট্ট সেকরার দোকান। দুটি মাত্র কর্মচারী। গোটা তিনেক আলমারি। তা হ'লে হবে কি—নামের বহর আছে। "স্বর্ণ মৃগ."

'গয়নাপত্র যা গড়াবার এখান থেকে গড়াই। চেনা দোকান। বহুকালের পরিচিত। চলি, দেখা হবে আবার।' ডলি দ্রুত পায়ে দোকানে ঢুকে গেলো।

আমি খুঁটি বনে গেলাম। একটু সময় তো দিতে হয় মানুষকে। সমস্ত ব্যাপারটা আচমকা ঘটে গেলো। ভাবতেও দিলো না।

মেসেব কাছ বরাবর এসে কথাটা মনে হলো। রসিক আছে সেকরাটি। ভারি মানানসই নামটি দিয়েছে। স্বর্ণ মৃগই বটে—আমার চুরাশী টাকার দড়ির জালে একে বন্দী করে রাখা যায় কখনও। মৃগ আর জাল দুই-ই যাবে। তখন কপালে হাত চাপড়ানো ছাড়া আর গতি থাকবে না।

তারপর অনেকদিন আর দেখা হয় নি ডলি সেনের সঙ্গে। দেখা করার ফুরসৎও ছিলো না। অফিসে বলাইদা টেবিল চাপড়ে গরম গরম কথা আওড়ালেন। মাগ্‌গীভাতা বাড়াতেই হবে। কেঁচোর মতন বেঁচে থেকে লাভ কি। কথাগুলো কারুর কারুর মনে লাগলো, বাকি সব মাতলো হুজুগে। অবশ্য এই হট্টগোলে মাইনে যদি কিছু বেড়েই যায়, মন্দ কি। বলাইদার কথায় সায় দিয়ে ফেললাম।

কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন হবে কে ভাবতে পেরেছিলো! ভীড় করে দাঁড়ানো কেরানীদের মুখের দিকে আলতো একবার নজর বুলিয়ে বড়ো সায়েবও টেবিলে হাত চাপড়ালেন, 'ভালোই হ'য়েছে, কিছু লোক ছাঁটাই করার এমনিতেই দরকার পড়েছিলো। আপনাদের দাবী মানা সম্ভব হবে না, যা খুশী করতে পারেন।'

আধ বুড়ো আর কিছু ছোকরার দল পিছিয়ে গেলো। এ বাজারে চাকরী গেলে পথে দাঁড়াতে হবে। মাথায় থাক মাগ্গী-ভাতা, আপনি বাঁচলে তবে জন্মদাতার নাম। কিছু লোক কিন্তু বেঁকেই রইলো। আমার ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। ভাত বাঁচাতে গেলে মান বাঁচে না। মান রাখতে হলে গাছের ছায়া আর রাস্তার টেপাকলের জল সম্বল। এমনি টলোমলো অবস্থায় ডলি সেনের কথা মনে পড়ে গেলো। ওর অফিসে কিছু একটা জুটিয়ে নিতে পারলে মান বাঁচে। লাঠি অক্ষত রেখে সাপকে ক্ষতবিক্ষত করা যায়।

অফিসের ভেতরে নয়, ছুটির একটু আগে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত কেরানীর দল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো। ছটা, সাড়ে ছটা, তারপর অফিস নিঃঝুম। দু একটা পিয়ন বেয়ারা ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। সদর দরজাও বন্ধ হ'লো একসময়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার শেষ উপায়ও। বাড়ীতে দেখা করার কথাটা মনে হলো। খুব ভোর ভোর একবার গেলে হয় না! কিন্তু তার আগেই অফিসে

বলাইদা এক কাণ্ড করে বসলেন। কোন এক সিনিয়র ইনচার্জকে বুঝি অপমান করেছেন মেজোসায়েব, উত্তেজিত মুহূর্তে তার হাত থেকে ফাইলটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, মুখে বলেছেন, 'get out.'

এ ব্যাপার হরদম হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় প্রতি অফিসে। এ নিয়ে মান অভিমান করার কি আর বয়স আছে আমাদের। অন্ন-দাতা যদি বলেই গরম কথা, তাতে রাগ করা চলে কখনো। চাল একটু শক্ত বলে বাড়া ভাত কেউ সরিয়ে রাখে? কিন্তু বলাইদা বললেন, 'ইনক্লাব' আর অর্ধেকের বেশি লোক আচমকা 'জিন্দা-বাদ' বলে বেরিয়ে এলো। হুড় হুড় করে লোক বেরিয়ে আসার সময় কেমন তালেগোলে আমিও বেরিয়ে পড়েছি, একেবারে খেয়াল নেই। কিন্তু বেরিয়ে এসে খেয়াল হ'লো, বেরোবার সময় অফিসের চৌকাঠ যতটা নিচু মনে হয়েছিলো, ঢোকার সময় কিন্তু অত নিচু আর ঠেকবে না। দোরগোড়াতেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে, হাজার মাথা খোঁড়া-খুড়ি করলেও ভেতরে ঢোকা যাবে না।

মনের এই অবস্থা নিয়ে টানা পোড়েন করতে লাগলাম ডলি সেনের অফিসে আর গলিতে। নিখোঁজ। জলজ্যান্ত মানুষটা গেলো কোথায়! অবশ্য গলি খুঁজে বের করলাম, পায়চারিও করলাম বার পাঁচেক। চোদ্দর পরেই উনিশ, সতেরোরই নামগন্ধ নেই তা আবার সতেরোর দুই।

পুরোপুরি একটা মাস গেলো। একত্রিশটা দিন কিন্তু এক-

ত্রিশ বছরের চেয়েও দীর্ঘ। বাঁধা রুটিন। রোজ অফিসের সামনে এসে জটলা করি, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখি সায়েবদের জানালাগুলোর দিকে। একটু কৃপাদৃষ্টি কিম্বা মুচকি হাসি, সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে আমরাও ঢুকে পড়ি অফিসে। কিন্তু কাকস্য। মেজো সায়েবকেও বলিহারি। সামান্য ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপার, তাও বাপের বয়সী একটা কেরানীর কাছে, মিটমাট করে ফেল্লেই হয়। বুলডগের গোঁ ধরে বসে থেকে আমাদের নাজেহাল করা।

মেজো সায়েব মেজাজে ভর করে দূরে সরে রইলেন, কিন্তু তৎপর হলেন মেসের ম্যানেজার, ত্রিলোচনবাবু। সময় নেই, অসময় নেই তাগাদা। দেড় মাসের খাই খরচা নব্বই টাকা পাঁচ আনা, কিন্তু হাবভাবে মনে হলো সেই কটা টাকার ওপরই যেন ও঳র মরণবাঁচন নির্ভর করছে।

প্রথমে নরম নরম কথা, হেঁ হেঁ ভাব, তারপরেই মেজাজ সপ্তমে। অফিসের অবস্থার কথা কেউ কানে তুলে থাকবে। ভালোয় ভালোয় টাকা বের করে না দিই তো ত্রিলোচন মিত্তির কেমন চিজ তা দেখিয়ে দেবেন। অবশ্য টাকা না দিয়েও সেটা দেখতে পারছি। কিন্তু অসহ্য হয়ে উঠলো। অন্য ভদ্রলোকের সামনে মান রাখা দায়।

একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে তোরঙ্গটা খুললাম। ছেঁড়া ধুতি খান কয়েক, ফুটো ফাটা পাঞ্জাবী আর সার্ট, কয়েকটা রুমাল, বি-এ পাশের সার্টিফিকেট—একেবারে তলায় কাপড়ে বাঁধা ছিলো জিনিসটা, সন্তর্পণে বের করলাম। মাঝারি ওজনের হার, তেঁতুল-

পাতা প্যাটার্ণ। বহু কালের জিনিস। মার গলার তুটি হারের একটি গেছে বৌদির গলায়, আর একটি আপাতত আমার জিম্মায়, যদি কোন বৌ আসে তো তারই হবে। কিন্তু তার আগেই যে ত্রিলোচনবাবু আসবেন এটা আর কে ভাবতে পেরেছিলো।

হারছড়া পকেটে ফেলে রাস্তায় পা দিলাম। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে কখন "স্বর্ণ মৃগে"র সামনে এসে দাঁড়িয়েছি খেয়াল নেই। তু এক মিনিটের দ্বিধা, সামান্য ইতস্তত ভাব, তারপরই লম্বা লম্বা পা ফেলে দোকানে গিয়ে উঠলাম। ভয়টাই বা কিসের। চোরাই মাল তো আর নয়।

অনেকক্ষণ, মিনিট পনেরো ধরে সেকরাটি নাড়াচাড়া করলো। মোটা পুরু ফ্রেমের চশমা নাকের ডগায় এনে উল্টেপাল্টে দেখলো, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো, 'বিক্রী না বাঁধা?'

বললাম, 'বাঁধা।' আশা ছিলো পয়সাকড়ি জোগাড় করে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারব এক সময়ে।

আবার পরীক্ষা চললো, এবার কষ্টিপাথরে। অন্তত শ দেড়েক টাকা পাওয়া গেলে মানটা বাঁচে।

একদৃষ্টে চেয়ে আছি কারিগরের দিকে, হঠাৎ ভাঙা চেয়ারটা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠলো। সেকরা চশমাটা কপালের ওপর তুলে হাত তুটো জোড করলো, 'মাপ করবেন, আগের টাকা শোধ না হলে আর একটি পয়সাও দিতে পারবো না। নেহাৎ চেনাজানা লোক বলে ওই তারের মতন চুড়ি ক'গাছা রেখেছি, যা দিয়েছি

তার ওপর একটি পয়সাও আর দিতে পারবো না।'

আমাকে নয় নিশ্চয়, কারণ আমার সঙ্গে সবে, কারবারের পত্তন। কাকে সেটা দেখার জন্য মুখ ফিরিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। মিটমিটে আলো, তা হোক, তা বলে নিজের লোককে চিনতে পারবো না, তা কি কখনও হয়।

ঝলমলে শাড়ী ব্লাউজ নয়, রংয়ের প্রলেপ নয়, বেঁটে ছাতা পর্যন্ত সঙ্গে নেই, কিন্তু আটপৌরে পোষাকেও ডলি সেন কম লোভনীয় নয়।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই রংয়ের ছোপ লাগলো দুটি গালে। ধার করা নয়, আসল রং।

হাতের ইসারায় তাকে দাঁড়াতে বলে সেকরার দিকে ফির-লাম। দর কষাকষি, দাম যাচাই, তারপর রফা হলো একশো কুড়িতে। তাহোক, ডুবন্ত লোকের কাছে খড় গাছটাই কি কম।

টাকাগুলো গুণে পকেটে রেখে দেখলাম ডলি সেন একভাবে ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গে দুজনে দোকান থেকে বাইরে এলাম।

বড়ো জোর তিন চার পা, তারপরই ডলি থেমে গেলো, 'আমায় তুমি মাপ করো!'

'মাপ!'

'হ্যাঁ মাপ, মিথ্যে কথা বলার জন্য। ভারতজ্যোতির পি এ আমি নই, ষাট টাকা মাইনের এজেণ্ট। কিন্তু ঝলমলে শাড়ী আর পোষাকে নিজেকে সাজিয়ে রাখতে হয়। রঙীন পোষাক

তো নয়, রঙীন পালক শিকার ভোলাবার জন্য।'

জনবিরল অন্ধকার পথ। মনে হলো ডলি সেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'একটা কথা রাখবে?' খুব মোলায়েম করলাম গলার স্বর।

'বলো।'

'একশ কুড়ি থেকে আপাতত আমার দরকার শ'খানেক। মেসের টাকা বাকি। কুড়িটা টাকা তুমি রেখে দাও।'

মিনিট কয়েক, তারপর ডলি সেন হাতটা প্রসারিত করলো।

টাকা নেওয়ার পরেও হাতটা ছাড়লো না। আস্তে বললো, 'এই এবার আমার একটা কথা রাখবে?'

'কি বলো?'

'চলো না, সেদিনের মতন বালিগঞ্জ স্টেশন দিয়ে বেড়িয়ে আসি কোথাও। নির্জন ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় শুধু দুজনে।'

ডলি সেনের টানা দুটি চোখে আমন্ত্রণ। রঙীন পালক নেই, তবু শিকারের বুক কাঁপে কেন। শুধু নির্জন কামরায় যাওয়া, সেদিনের পুনরাবৃত্তি নয়! কাছে আসার শপথ নয় আর!

আলোকোজ্জ্বল রাস্তার ওপরে এসেই ডলি সেন দাঁড়িয়ে পড়লো। একটু এগিয়ে আমিও থেমে গেলাম, 'কি হলো থামলে কেন? এর পরে গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। যেতেই তো ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।'

'শোনো' থমথমে গলার আওয়াজ।

'কি?'

'থাক্, আজ আর গিয়ে কাজ নেই। যেতে আসতে এক একজনের প্রায়·সাড়ে দশ টাকার মতন পড়বে ফার্স্ট ক্লাশে, তাই না ?'

তাই-ই। এঁদিকটা একেবারে ভাবি নি, অথচ সবচেয়ে আগে ভাবা উচিত ছিলো। এত টাকা খরচ করে এ ছেলেমানুষীর কোন মানে হয় !

'জানো ওই টাকায় কত চাল হয় ?' ডলি সেন হাসলো। তা জানি, এও জানি এক সপ্তাহের মেস খরচ হয় ও টাকায়। আরো অনেক অনেক কিছু, বিশেষত এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি ও টাকার দাম অনেক।

'চলি,' ডলি সেন অপূর্ব ঘোষাল লেনে ঢুকলো।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম, দুঃখের নয় তৃপ্তির। মনে হলো কোনদিন যেন আর ডলি সেন ফিরে না আসে। মুখোমুখি না দাঁড়ায়। দুটি চোখে অতৃপ্ত কামনা নিয়ে তো নয়ই, বুকে অনন্ত বুভুক্ষা নিয়েও নয়।

পুতুল

একেবারে কোণাকুণি বাঁক। দেহের ধাক্কা বাঁচানো গেলো কোনরকমে কিন্তু মন জখম হলো। এথিক্সের বইটা প্রথমে সিঁড়ির চাতালে তারপর গড়িয়ে লনের ওপর গিয়ে পড়লো।

কুড়োতে যেতেই বাধা দিলাম, 'ব্যস্ত হবেন না, ওর পালা শেষ হয়ে গেছে।'

'শেষ হয়ে গেছে ? মানে ?' নিচু হতে গিয়েও আবার সোজা হয়ে মালতী সেন দাঁড়িয়ে পড়লো। কাজলায়িত চোখে অশেষ জিজ্ঞাসা। ইচ্ছা করেই দোলালো দুটো হাত। কটাই বা চুড়ি কিন্তু জলতরঙ্গের শব্দ।

'ভাবছি ফিলসফি ছেড়ে দেবো,' আমি বইটা কুড়োতে কুড়োতে বললাম।

'ছেড়ে দেবেন ?' এবারে মালতী সেন দোলালো কানের রিং দুটো। বইটা কুড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, গলাটা যথাসাধ্য নিস্পৃহ করে, 'বাঙলা নেবো।'

ইঙ্গিতটা ব্যর্থ হলো না। তীর ষাঁড়ের অক্ষিতারায় গিয়ে বিঁধলো। ছোট্ট দুটো কাঁধ বিলিতী কায়দায় ঝাঁকি দিয়ে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বললো, 'silly'।

আর দাঁড়ালো না। হিলতোলা সোয়েডের জুতোর শব্দ তুলে করিডরের বাঁকে মিশে গেলো।

প্রিয়তোষেব স্পর্শ না পেলে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে থাকতাম সেখানে তা আমিই জানি না।

সহপাঠী প্রিয়তোষ। বাপেব তিনখানা বাড়ী, সবগুলোই তিনতলা। চকলেট বংয়েব গাড়িটাব যা দাম শুনি তাতে আমার তিনপুরুষ সে টাকায় বসে খেতে পাবে। শুধু গ্রাসই নয়, আচ্ছাদনসুদ্ধ।

স্পর্শ বললাম বটে, কিন্তু স্পর্শ নয় থাবা। মনেব আক্রোশ কিছুটা মেশানো ছিলো তাতে।

'কতদিন এ ব্যাপাব চলছে ?'

'কলেজে আসা-যাওয়া ?' মুখটাকে মুখোস কবে তুলি, 'তা প্রায় বছব চাবেক।'

'কলেজে আসা-যাওয়া নয়, এই কবিডরেব বাঁকে অস্ফুট গুঞ্জন ?'

এবার হাসলাম। অবশ্য প্রিয়তোষকে না চটিয়ে যতটুকু হাসা যায় ঠিক ততটুকুই। বললাম, 'গুঞ্জন কি না জানি না কিন্তু অস্ফুট নিশ্চয় নয়। নইলে আব আপনাব কাছে ধবা পড়ি ?'

প্রিয়তোষেব থাবাটা কাঁধেব ওপব আবো শক্ত হয়ে বসলো। স্বাধীন দেশে রয়েল বেঙ্গল কথাটা হয়তো আর বলা যাবে না। একেবারে ন্যাশনাল বেঙ্গলের থাবাব মত।

'এদিকে আসুন, কথা আছে।'

এদিকে মানে আধ মাইল তফাতের "নয়নতারা কেবিনে"।

চায়ের দাম আমাকে দিতে হলো, প্রিয়তোষের চিবানো চপ দুটোর দামও।

'কতদিন চেনেন ওকে ?'

'কি রকম চেনার কথা বলছেন ?' দেশলাই জ্বালানোর চেষ্টা করতে করতে বললাম।

'কাব্য করবেন না আমার কাছে। ওসবের জন্য কলেজ ম্যাগাজিন আছে।' প্রিয়তোষ আকাশের দিকে মুখ তুলে গর্জন করলো, 'আমি বলছি মালতী সেনের সঙ্গে আলাপ কতদিনের ?'

'আজ, এই একটু আগে,' আমি সিগারেটটা নিভিয়ে পকেটে রেখে দিলাম।

দুটো ভুরুর মাঝখানে প্রিয়তোষ আড়াইটে আঁচড় ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে কপালেও সমান্তরাল দুটো রেখা। অবিশ্বাসের দ্যোতক। 'এর আগে কোনদিন কথা বলেন নি ?'

ঘাড় নাড়লাম। উঠেও দাঁড়ালাম সেই সঙ্গে। ক্লাস আছে।

'উঠছেন কোথায় ?' প্রিয়তোষের হুঙ্কার একটু চাপা কিন্তু অবহেলা করার সাহস হলো না। বসে পড়তে পড়তে খুব মৃদু গলায় বললাম, 'মানে, ইয়ে, বি, পি'র ক্লাস রয়েছে, মেটাফিজিক্স !'

'রাখুন আপনার 'বি পি'র ক্লাস আর মেটাফিজিক্স। এ ব্যাপারটা আপনার ক্লাস করার চেয়ে অনেক দরকারী।' প্রিয়তোষ ইঙ্গিতে 'বয়'কে আবার ডাকলো।

আরো দু কাপ চা, সঙ্গে চপ, এবারে আলুর।

'আপনি সত্যব্রত সেনকে চেনেন ?' প্রিয়তোষ একটা চপ শেষ করে বাকিটা ধরলো।

সত্যব্রত সেন ? নামটা খুব চেনা চেনা মনে হলো। মনের অলিগলি হাতড়াতে শুরু করলাম। ভাবছি লোকটা কলেজের না কলেজের বাইরের, এমন সময় প্রিয়তোষের গলায় বাধা পেলাম।

'কেমিষ্ট্রির প্রফেসর সত্যব্রত সেন। এবার 'ডি এস-সি'র থিসিস সাবমিট করছেন। ফর্সা বেঁটে লোকটি।'

হবে। নিজের পড়ার বই নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞানের খবর রাখি না। কিন্তু ব্যাপারটা কি। আজকের করুণ রসের সঙ্গে রসায়নের একটা সম্পর্ক আছে নাকি।

প্রিয়তোষই পরিষ্কার করে দিলো ব্যাপারটা। 'সত্যব্রত সেন সপ্তাহে অন্ততঃ বার দুয়েক নিয়মিতভাবে মিস সেনের বাড়ীতে যান।'

'বাড়ীতে ?'

'হ্যাঁ, তিনের দুই টেম্পল লেন।'

'বোধহয় সাহায্য করতে যান। পরীক্ষা তো সামনে।' আমি নিরাসক্ত গলায় বললাম কথাগুলো।

'হুঁ,' প্রিয়তোষ অবজ্ঞার হাসি হাসলো।

'এই বুদ্ধি নিয়ে পাশ করলেন কি করে ? কেমিষ্ট্রির প্রফেসর বাংলায় কি সাহায্য করবে ? ব্যাপার অন্য। বুঝেছেন নিশ্চয় ?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লাম। না বুঝলে আরো ঘণ্টাখানেক

সময় কাটবে, তার ওপর অন্ততঃ এক কাপ চা আর চপ গোটা-দুয়েক, সব আমার পয়সায়।

প্রিয়তোষের কবল থেকে মুক্তি পেলাম ঘণ্টা দেড়েক পরে। প্রায় মোহমুক্ত অবস্থায়।

দিনতিনেক পর।

উডওয়ার্থের সাইকোলজির তলায় রেখে একটা নভেলের ওপর চোখ বোলাচ্ছি। আগে বার চারেক পড়া ছিলো, কিন্তু প্রতিবারেই কি নতুন! নাকি বয়সের রং মিশে প্রতিবার লোভনীয় করে তুলছিলো বইটাকে।

'বইটা কি আপনি ফেরৎ দেবেন না?' বামাকণ্ঠে চমকে উঠলাম।

যথাসাধ্য কোণ ঘেঁষে বসেছিলাম সহপাঠীদের লক্ষ্যের বাইরে।

অবশ্য সহপাঠিনীদের কথা ভাবিনি। ভেবেও লাভ কি, তাদের তো সর্বত্র গতি। কলেজের আনাচে-কানাচে, মনেরও।

ঘাড় ফেরাতেই ঘাবড়ে গেলাম। আবার মালতী সেন। প্রসাধন আরো উগ্র।

'আমায় কিছু বললেন!' নিষিদ্ধ বইটা সামলে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

'আবার কে আছে এখানে?' মালতী সেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো।

চমক লাগলো। মালতী সেনের গলার আওয়াজে নয়, বলার

ঢংয়ে। আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই এ পৃথিবীতে এমনি ধরনের কথা যেন। রোমাঞ্চিত হবার চেষ্টা করতেই প্রিয়তোষের মুখ মনে পড়ে গেলো, পাশাপাশি সত্যব্রত সেনেরও। কঠিন মাটিতে পা ঠেকালাম।

'কোন্ বইটার কথা বলছেন ?'

'সবই তো জানেন। লাইব্রেরিয়ানের কাছে খোঁজ পেলাম যে বইটা আপনি মাস দুয়েক ধরে আটকে রেখেছেন।'

অনুভবে বুঝলাম কপালে ঘামের ফোঁটা জমেছে। কানের পাশদুটো ঈষদুষ্ণ ঠেকলো। বামালসুদ্ধ ধরা পড়ার ব্যাপার।

'মানে, বইটা নিয়ে রেখেছি বটে কিন্তু কলেজের পড়ার চাপে একটুও সময় পাচ্ছি না পাতা ওল্টাবার।' অকুণ্ঠচিত্তে বলে গেলাম কথাগুলো।

'ওঃ, এতক্ষণ কি পড়ছিলেন ?'

প্রশ্নটা সাদাসিধে। খোঁচখাঁচের বালাই ছিলো না। কিন্তু অপরাধীর মন তো। বিচলিত হয়ে পড়লাম, 'মানে, এই উড-ওয়ার্থের বইটা ওল্টাচ্ছিলাম বসে বসে। পরীক্ষার আর তো দেরীও নেই বিশেষ !

'ওপরেরটা নয়, তলারটার কথা বলছি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মালতী সেনের। রঞ্জন-চোখের সামিল। ডারমিস এপিডারমিস ফুঁড়ে রক্তকণিকায় গিয়ে পৌঁছোয়। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা অবশ্য করলাম না। কবুল করাই ভালো, নয়তো মিথ্যে কথার ধাপে ধাপে পা দিয়ে কোথায় গিয়ে

পৌঁছোবো তার ঠিক আছে।

'দিন বইটা আমায়।' সোনার ঘড়িসুদ্ধ হাতটা মালতী সেন প্রসারিত করলো।

দ্বিধা করলাম না। এমন একটা প্রসারিত সুডৌল হাতে বই কেন, অনেক কিছুই দেওয়া যায়।

হয়তো প্রয়োজন ছিলো না তবু বললাম, 'বইটা কিন্তু লাইব্রেরীর।'

সমস্ত শরীরে লাবণ্যের ঢেউ তুলে মালতী সেন ফিরে দাঁড়ালো, 'এ কথার মানে?'

'ফেরৎ দেবার একটা তারিখ দেওয়া আছে।' খুব ভিজে গলায় বললাম।

'ও তারিখ আমার জন্য নয়।' মালতী সেন দ্রুতপায়ে ঘরে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কথাটা সত্যি। তারিখ, সময়, দিনক্ষণ কিছুই ওর জন্য নয়। ট্রাফিক পুলিশের প্রসারিত হাতের পিছনে স্তব্ধীভূত যানবাহনের মতন সব কিছু ওর জন্য থমকে থাকে। বুঝি পুরুষের হৃৎস্পন্দনও।

বই ফেরৎ পাওয়া গেল দিন দশেক পরে। এর মধ্যে বার দুয়েক লাইব্রেরীয়ানকে চা খাইয়ে তুষ্ট রাখতে হয়েছে। ফাইন সহ্য করা যায়, কিন্তু লাইব্রেরীয়ান ষষ্ঠি বাড়ুয্যের দাঁত-খিঁচুনি নয়।

কলেজ শেষ ক'রে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছি, এমন সময়

থামতে হলো, 'কলহাস্যগীতে সিন্ধুর বিজয় রথ' নদীতে ঢোকার মত একপাল মেয়ে লনে পা বাড়ালো। শব্দ, বর্ণ, গন্ধ, ত্রয়ীর অপূর্ব সমাবেশ। পাশ কাটিয়ে বিপথে চলার মুখেই বাধা পেলাম, 'এই যে কোথায় থাকেন বলুন তো?'

প্রশ্নটা আকস্মিক। উত্তর দিতে একটু দেরী হয়ে গেলো। তার আগেই মালতী সেন বইটা এগিয়ে দিলো, 'নিন, আরো আগে বোধ হয় দেওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু পড়া শেষ ক'রে উঠতে পারি নি। আমার আবার খুব আস্তে পড়া অভ্যাস কিনা। অসুবিধা হয়নি কিছু?'

অসুবিধা? না, লাইব্রেরীয়ানের কাছে তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু এখন হলো, এই মুহূর্তে। সঙ্গের মেয়েদের বাঁকা চাউনি আর মুচকি হাসিতে বেশ অসুবিধা হলো। ওদের ভাবটা যেন শুধু বই দেওয়া-নেওয়ার পালাই তো!

ঈশ্বর সহায় ছিলেন, এসব ব্যাপারে অবশ্য প্রায়ই তিনি বাগড়া দেন। প্রিয়তোষ বাইরে কোথায় খেলতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে সেখানকার হাসপাতালেই পড়েছিলো, কাজেই কৈফিয়ৎ তলব করার মতন কেউ ছিলো না, একমাত্র নিজের বিবেক ছাড়া।

অক্টোপাশের মতন পরীক্ষাটা বাহু বিস্তার ক'রে আসায় অনেক দিন মালতী সেনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ ক'রে উঠতে পারি নি।

পরীক্ষা শেষ ক'রে সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে সামনের মাস

তিনেকের ছুটিটা কিভাবে কাটানো যায় ভাবছি, এমন সময় মালতী সেনের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেলো। লন পার হ'য়ে এদিকেই আসছিলো। আমাকে দেখে গালে-টোল-ফেলা হাসি হেসে বললো, 'কি ব্যাপার, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাকে খুঁজছেন ?'

কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেলো, সূর্যের শেষ রশ্মিলাগা-গাছের পাতা চিকচিক-করা বিকেলে, তন্বী তরুণীর রূপের আনাচে দাঁড়িয়ে সব ভুল হ'য়ে গেলো, নয়তো এমন লাগামছাড়া কথা বলা আমার কস্মিন্‌কালে অভ্যাস নয়।

বললাম—'হৃদয় যাহারে চায়,……।' রসিকতাটা 'অরসিকাস্থ' হয়ে গেলো। আঁকা ভুরু হুটো অল্প তুলে মালতী সেন ঝঙ্কার দিলো, 'এথিক্সের পাতায় এত রস পান কোথা থেকে ?'

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'-এর সেই পাথরচোষা গাছ-টার উদাহরণ দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই মালতী সেন নিজের লাল ভ্যানিটিব্যাগের ফাঁস খুলে বাসন্তী রংয়ের কার্ড বের করলো একটা।

সর্ব্বনাশ ! প্রজাপতয়ে নাকি ? মাসটাও তো বিয়ের লগ্ন-কণ্টকিত। হ'লেই হলো। মালতী সেন অন্যের কণ্ঠলগ্না হ'বে সে ভয়ের চেয়ে নিজের আথিক অবস্থার কথাটা ভেবে আরো কুঁকড়ে গেলাম। গোটা চারেক টাকা সম্বল, মাস শেষ হ'তে তখনও গোটা দশেক দিন বাকি !

কার্ডটা হাতে ক'রে ভুল ভাঙলো। বিয়ে নয়, তবে আমার

পক্ষে সমানই মারাত্মক—জন্মদিন। মালতী সেনের জন্মতারিখ এ-ভাবে বছরের পর বছর পালন করার কি সার্থকতা সেটা ওঁর বাড়ীর লোকই বলতে পারবেন। সে বিষয়ে প্রশ্ন করাও আমার সমীচীন নয়, কিন্তু আমাকে ঘায়েল করা কেন?

ঠোঁট কামড়ে ভাবনায় পড়েছি এমন একটা মুখের ভাব করলাম।

'কি ভাবছেন?'

'না, মানে, ওই দিনে আর কোন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে কিনা ভাবছি!'

হঠাৎ পাহাড়ী ঝর্ণার বাঁধ সরে গেলে কলরোল ক'রে যেমন লক্ষধারায় স্রোত ছোটে, ঠিক তেমনি শব্দ ক'রে মালতী সেন হাসিতে ভেঙে পড়লো।

যৌবনপুষ্ট তরুণীর উচ্ছ্বসিত হাস্যময়ীরূপ ভালোই লাগে, কিন্তু সেই হাসির কারণটা না জানা পর্যন্ত মন উসখুস করে। সে হাসির খোরাক নিজেকেই যোগাতে হলে, উপভোগ করার মত মনের অবস্থা হওয়ার কথাও নয়।

'আপনি হাসাবেন না আর। আপনার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট তো বড় জোর গলির মোড়ের "কাত্যায়নী কেবিন"। একটা দিন না হয় অনুপস্থিতই হলেন সেখানে। পার্সেণ্টেজ যাবার যখন ভয় নেই।'

রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। মেয়ে ইনস্পেক্টর নেওয়ার মত সরকার গোয়েন্দা বিভাগে কিছু মেয়ে চালান দিচ্ছেন নাকি?

নয়তো রামতনু বোসের চায়ের দোকানের খবর তিনের দুই টেম্পল লেনের মেয়ে পায় কি ক'রে ?

মনের শঙ্কার ছায়া হয়তো মুখে-চোখে ফুটে থাকবে। মালতী সেন হাতটা বাড়িয়ে বরাভয়ের আভাস দিলো, 'ভয় পাবেন না, ওই গলিতে আমার মাসীমার বাড়ী কিনা, যেতে আসতে ও দোকানটায় অনেক দিন দেখেছি আপনাকে।'

যাবার জন্য আর একবার অনুরোধ ক'রে মালতী সেন লন পার হলো। আমি তখনও সিঁড়ির ধাপে।

নিজের চার টাকা আর রুম-মেট গজেনবাবুর কাছ থেকে ধার পাওয়া দু'টাকা দিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ আর কিছু রজনীগন্ধার ঝাড় নিয়ে যখন তিনের দুইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম তখনও পুরো বিকেল। সন্ধ্যার ধূপছায়া শাড়ীর আঁচলও দেখা যায় নি আকাশে। এখনই ঢোকা হয়ত অনুচিত, কিন্তু এরকমভাবে ফুলের ঝাড় বুকে আঁকড়ে বেপাড়ার গলিতে পায়চারি ক'রে বেড়ানোর বিপদও তো কম নয়।

সাতপাঁচ ভেবে গেট পার হলাম। দু'পা এগিয়েই বিদ্যুৎবেগে পাঁচ পা পিছিয়ে এলাম। একেবারে বাঘা কুকুর। নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে, চোখ আমার দিকে। মানুষকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে, এ জানোয়ারটাকে এভাবে শৃঙ্খলমুক্ত করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে বাড়ীর মালিকরাই বলতে পারেন, আমার অবস্থা তখন চরমে। হাতের রজনীগন্ধার গোছার

কিছুটা হাত থেকে ধুলোয় গিয়ে পড়লো। হাত অত কাঁপলে ফুলের গোছা কখনও ধরে রাখা যায়? কাব্যগ্রন্থটিকে অবশ্য মাটির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখলাম।

ডোরাকাটা পাজামা, সিল্কের হাতকাটা শার্ট, চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা, মুখে চুরুট একটি কড়া মেজাজের ভদ্রলোক ওপরের গাড়ী-বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ওপারে বাঘা, এপারে আমি, মাঝখানে নিচু গেট। লোহার গেট বটে, কিন্তু বাঘার আক্রোশের ভর যে বেশীক্ষণ সইতে পারবে এ ভরসা কম। ভদ্রলোক একবার চোখ বুলিয়েই ব্যাপারটা আন্দাজ করলেন। দুটো ঠোঁট ছুঁচোলো ক'রে শিস দিলেন, তারপর গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'জলি'!

আশ্চর্য, দুর্জয় বাঘা মেনী বেড়ালের মতন ল্যাজ গুটিয়ে পিছিয়ে গেলো। এবার ভদ্রলোক নজর দিলেন আমার দিকে, 'আসুন, আসুন, সোজা ওপরে চলে আসুন।'

রজনীগন্ধার ঝাড়গুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে উঠেই থমকে দাঁড়ালাম। এবার বাঘা নয়, মেয়ের পাল। বিচিত্র পোষাক, বিচিত্রতর প্রসাধন। গোধূলিতে আরো যেন মনোরম।

মালতী সেন উঠে এলো, 'আসুন আসুন।' বই আর ফুলের ঝাড় এগিয়ে দিলাম।

'একি এমন সুন্দর ফুলগুলোয় ধুলো লাগালেন কি ক'রে?' মালতী সেনের দামী আঁচল ফুলের পাপড়ীতে নেমে এলো।

'ধুলোই তো চিরন্তন। সব কিছুর পরিণতি তো ধুলোয়, তাই ধুলোর আওতা থেকে কোন কিছুকে বাঁচাবার চেষ্টা করি না।' গলাটা যথেষ্ট কাঁপছে, দার্শনিকতার সুর হয়তো ভালই ফুটলো।

পিছনে সম্মিলিত মেয়েদের উচ্চহাস্যে মালতী সেনের গলা ডুবে গেলো। তার পাশাপাশি ঘরে এসে ঢুকলাম।

যা ভয় করেছিলাম তা মোটেই নয়। নিমন্ত্রিত পুরুষ আমি একা নই, প্রিয়তোষ আর সত্যব্রত সেন দুজনেই এলেন। বসলামও পাশাপাশি। প্রিয়তোষের দুটো চোখের আগুন সত্যব্রত সেনের মুখের চুরুটের আগুনের চেয়েও তীব্র। আমার দেহটা ভস্ম করতে সক্ষম হোল না বটে, মনটাকে কিন্তু বেশ দমিয়ে দিলো। নিজেকে যেন অনাহূত মনে হতে লাগলো।

জন্মদিনে মালতী সেনের আরো একটা পরিচয় পেলাম নতুন ক'রে। ভারি মিষ্টি গলা, সুরের কারসাজিই শুধু নয়, দরদের ছোঁয়াচ পুরোমাত্রায়। পর পর তিনটে গান গাইলো। তারপর গানের চেয়ে অদ্ভুত এক কাণ্ড ক'রে বসলো।

হারমোনিয়াম সোজা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'নিন, এবার গান একটা।'

সার্টের কলারটা ঘামে ভিজে লেপটে গেলো ঘাড়ের সঙ্গে, আঙুলের ডগাগুলোয় তাণ্ডব নাচের ছন্দ। পাছে প্রিয়তোষের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে যায়, সেই ভয়ে কার্পেট থেকে চোখই তুললাম না। মেয়েরা ফরওয়ার্ডদের পায়ে পায়ে পাস ক'রে

বল নিয়ে আসার কায়দায় হাত দিয়ে ঠেলে হারমোনিয়মটি আমার সামনে এনে ফেললো। আমাদের পাড়ায় মালতী সেনের মাসীমার বাড়ী। একেবারে আমাদের পাশের বাড়ীটাই কিনা কে জানে। কোন্ দুর্বল মুহূর্তে হয়তো ছাদে বসে গান গেয়ে থাকবো, মাসীর মারফৎ সে খবর প্রচারিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপত্তির ভান করা বৃথা, আর ক'রলেই বা কে শুনছে।

প্রথম গানটা গলার জড়তার জন্য একটু আটকে গেলো, কিন্তু পরের গান দুটোয় ঠিক পুষিয়ে নিলাম। মেয়েদের পায়ের তাল শুরু হতে বুঝলাম গানটা জমেছে। আরও নিশ্চিন্ত হলাম যখন ডোরাকাটা পাজামা পরা ভদ্রলোকটি বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ারের হাতলে তাল ঠুকতে লাগলেন —একেবারে বেতালা অবশ্য।

বাঘার ভয়ে খুব সাবধানে সকলের পিছনে নামছি। সিঁড়িতে আবছা নীলাভ আলো। সিঁড়ির ধাপ ঠাওর করাই মুস্কিল। আন্দাজে পা ফেলছি, আচমকা হাতের ওপর আর একজনের হাত পড়তেই চমকে উঠলাম। প্রিয়তোষ নয়, কারণ সে আগেই চলে গেছে। তবে? ঘাড় ফেরাতেই আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। মালতী সেন। দুটি চোখে অপূর্ব মাদকতা, দুটি হাতে আমারই দেওয়া রজনীগন্ধার ঝাড়।

'চমৎকার গলা কিন্তু আপনার।' মালতী সেনের অস্ফুট গলার আওয়াজ।

হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারলাম না। কিই বা দেবো

উত্তর। আমার না হয় শুধু গলাটাই চমৎকার। কিন্তু মালতী সেনের কোনটা অসুন্দর! ওর কথাতেও তো গানের সুর, চলায় নাচের ছন্দ।

'মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু, ভুলে যাবেন না।' মালতী সেন পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো।

সেই মুহূর্তে অবশ্য সব কিছু ভুলে গেলাম। পৃথিবীর স্পর্শ গন্ধ রূপ সমস্ত নিঃশেষে মুছে নিলো। কানের কাছে কেবল ঝঙ্কৃত হলো মালতী সেনের আহ্বান। এ যুগের নয়, যুগান্তরেরও। নিজের মনে মনে ভুলে না যাওয়ার অঙ্গীকার করলাম।

তারপরে অনেকদিন অবশ্য মালতী সেনের বাড়ী যাওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ ছিলো। আমি কোনরকমে পাশ করেছিলাম কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও মালতী সেনের নাম পাই নি।

প্রফেসারির আশায় মাঝারি ছোট অনেক কলেজে ঘোরা-ঘুরি করে অবশেষে মা'র সেজকাকাকে ধরে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে ঢুকে পড়লাম। দালাল নয় কেরানী। মাগ্‌গিভাতা নিয়ে একশ বাইশ। দর্শন পড়া থাকায় অল্প মাইনের শোকটা অল্পদিনেই সামলে উঠলাম।

একটানা ঢেউয়ের মতন অনেকের দিন কাটে, কিন্তু তাওতো ভালো। ঢেউয়ের মাথায় থাকে ফেনার ঝালর, আমার দনগুলো আরো বৈচিত্র্যহীন, আরো একঘেয়ে।

সেদিন অফিসফেরৎ ট্রামের পা-দানে আশ্রয় খুঁজছি, হঠাৎ দেখলাম রাস্তার ওপারেই মালতী সেন। পড়ন্ত বেলা কিন্তু

চোখদুটি গগ্‌লসে ঢাকা, মুখের হাসি অম্লান।

'চিনতে পারছেন ?' নমস্কারের ভঙ্গীতে হাতদুটো তুললাম।

'পারছি বৈকি, কিন্তু আপনার কি ব্যাপার বলুন তো, দেখাই পাওয়া যায় না ?'

আসল কারণটা চেপে যাই, থেমে থেমে বলি, 'অফিস করতেই সারাটা দিন কেটে যায়। যাবো যাবো করেও আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

'অফিস বুঝি একলা আপনিই করছেন, আমরা আর করি না ?'

অফিস করে মালতী সেন ! টেম্পল লেনের লাল দুতলা বাড়ীর বাসিন্দাকে রুটির খোঁজে ড্যালহৌসি স্কোয়ারে আসতে হয় ! কেমন অস্বাভাবিক ঠেকলো কথাটা। বলতেই মালতী সেন মুচকি হাসলো, 'টেম্পল লেনের বাড়ী আমাদের বিক্রি হয়ে গেছে, আমরা এখন আছি অশ্বিনী ঘোষাল লেনে। চলুন না আজকে, নাকি বাড়ীতে দেরী হলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।'

কৈফিয়ৎ নেবার লোক যে এখনও আসে নি বাড়ীতে সে কথাটা বললাম। যেতে কোন বাধা নেই।

পাঁজর বের করা নোনা ধরা একতলা বাড়ী। পাড়াটাও বস্তিবহুল। গেটের বালাই নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়েই কড়া নাড়া চলে।

শুধু স্থানান্তরই নয়, রূপান্তরও। সেদিনের ডোরাকাটা

পাজামা-পরা ভদ্রলোকটিই দরজা খুলে দিলেন। পরনে কাপড়—পরিধি হাঁটু পর্যন্ত। গায়ের গেঞ্জিটি সহস্রছিন্ন।

ঘরে ঢুকেই মালতী সেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

'শেয়ার মার্কেটের নাম শুনেছেন? যেখানে রাজা ফকীর হয়, আর ফকীর সুলতান।'

বেশী বলতে হলো না সবই বুঝলাম। রাজার ফকীর হওয়ার পালা চলেছে।

প্রথম প্রথম সপ্তাহে একবার তারপর এমন অবস্থা হলো অফিসফেরৎ রোজ একবার করে দেখা না হলে সব কিছু বিস্বাদ হয়ে যেতো, লবণহীন সুরুয়ার মতন। মেয়ে কেরানী আর ফাইল ক্লার্কের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য আর কলেজের করিডরের বাঁকের প্রয়োজন হতো না। জনস্রোতের মাঝখানে অবিরাম দেখাশোনা চলতে লাগলো।

যেমন আচমকা মালতী সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তেমনি আচমকা একদিন খেলার মাঠে প্রিয়তোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। উত্তেজনার মুহূর্তে কখন দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম হঠাৎ পিছন থেকে বজ্রগম্ভীর গলার আওয়াজ হলো, 'মশাই বসুন।' ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম সারাটা কলেজ জীবনে যে আমাকে ক্রমান্বয়ে বসিয়ে এসেছে, সেই প্রিয়তোষেরই গলা। কাজেই বসলাম, নিজের সিটে নয়, একেবারে প্রিয়তোষের পাশে। একথা সেকথার পর মালতী সেনের কথাও বললাম। গোলের মুখে বল কাড়াকাড়ি হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়তোষ আমার দিকে ঘুরে

বসলো, 'ঠিকানাটা কি ? টেম্পল লেনের পরে আর কোন খোঁজ পাই নি।'

ঠিকানা বললাম। গলির নামটা অবশ্য আর বাড়ীর বাইরের চেহারাটা কারণ নম্বরটা আমিও জানতাম না।

কিন্তু বাড়ী খুঁজে নিতে প্রিয়তোষের ভুল হয় নি, সে খবর দিনদুয়েক পরেই পেলাম মালতী সেনের কাছে।

থমথমে মুখের ভাব, আসন্ন বর্ষণের প্রাকমুহূর্ত। 'কি হলো ?' তক্তপোষে বসতে বসতে বললাম।

'আপনার কি কোনকালে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না ?'

রীতিমত ঘাবড়ালাম। মালতী সেনই কথাটার জট ছাড়িয়ে দিলো, 'আমার ঠিকানা প্রিয়তোষ বসাককে বলতে গেছেন কেন ?'

'এসেছিলো নাকি ?'

'এসেছিলো মানে, প্রকাণ্ড গাড়ী হাঁকিয়ে। এ ঘরে হাওয়া কম বলে গড়ের মাঠের হাওয়া খাইয়ে আনতে চায়। সারা কলেজ-জীবনটা কম জ্বালিয়েছে !'

'গেলেই পারতেন।' মালতী সেনের মুখের দিকে চেয়েই বাকি কথাগুলো গিলে ফেললাম।

আঁচলটা শক্তহাতে বুকের কাছে মুঠো করে ধরে মালতী সেন টান হয়ে দাঁড়ালো, 'আপনারা কি ভাবেন বলুন তো আমাদের ? চিনেমাটির রংচংয়ে পুতুল, না ? দুমুঠো পয়সার বদলে তুলে নিলেই হলো ?'

তারপর থেকে আর প্রিয়তোষের কথা জিজ্ঞাসা করি নি ; সত্যব্রত সেনের কথা তোলবার প্রয়োজনই হয় নি, কারণ টেম্পল লেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সম্পর্ক ছেড়েছিলেন।

বরাতক্রমে অফিসে একটা লিফ্‌ট্‌ পেলাম। নিজের কৃতিত্ব কিছু নয়, এও মার সেজকাকার দৌলতে। কিন্তু বাড়তি রজত-খণ্ড মাসান্তে মুঠোয় এলো। টাকাই সালসার কাজ করে। শক্তি জোগায়। যে কথাটা এতদিন বলি বলি করেও বলতে পারি নি, সে কথাটা ডালহৌসি স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে চলমান কেরানী-স্রোতের মাঝখানেই বলে ফেললাম।

একটু চাঞ্চল্য নয়, শিউরে ওঠা নয়, মালতী সেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনলো কথাগুলো, তারপর খুব আস্তে বললো, 'বড় দেরী করে ফেললে, আর দুটোদিন আগেও যদি বলতে কথাটা।'

দুটো দিন আগে! মাইনের টাকাটা হাতে না এলে কলিজায় জোর আসে কখনও! কিন্তু দুটো দিনে এমনকি ঘটলো মালতী সেনের জীবনে?

ডালহৌসি স্কোয়ারে নয়, কার্জন পার্কে বসে সব বললো মালতী সেন। দুদিন আগে কথা ঠিক হয়ে গেছে। টেম্পল লেনের বাড়ীটা বাঁধা আছে যাঁর কাছে, তারই ছোট ছেলে। টাকার গদিতে পাশ ফেরে, নোটের তাড়ায় সিগারেট ধরায় এমনি অবস্থা। মালতী সেনকে পেলে ওবাড়ীর দলিল ফেরৎ দিয়ে যাবে মালতী সেনের বাপের হাতে।

কেমন ছেলে? মালতী সেন মুচকি হাসলো। বড়

লোকের আদুরে ছেলের সব দোষ আছে হয়তো, সব রোগও, কিন্তু টেম্পল লেনের পুরোনো বাড়ীতে ফিরে না গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবেন না মিঃ সেন। এ কথার পরে আর মালতী সেনের পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন ওঠে নি, যাচাই করার বালাই তো নয়ই।

'আজ আমাদের শেষ আলাপ, অবশ্য নিভৃতে। ইচ্ছা করলে তুমি আমাদের টেম্পল লেনের বাড়ীতেও যেতে পারো, কিন্তু আর নাই গেলে।' নরম হয়ে এলো মালতী সেনের গলা। ভিজে ভিজে।

শুরুতেই সারা। বলতে গিয়েই থেমে গেলাম। হাতের ওপর গরম জলের ফোঁটা এসে পড়লো। বেশী নয় ফোঁটা দুয়েক। কিন্তু শেষের দিনে এই দু' ফোঁটাতে বুঝি কথা শেষ হয়ে গেলো।

আস্তে উঠে পড়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে এলাম। মালতী সেন যাবে ওদিকের গেট দিয়ে। আজ তো টেম্পল লেনে নয়, আজ ফিরবে স্যাঁতসেঁতে পাঁজর বের করা অশ্বিনী ঘোষাল লেনে। কিন্তু শুধু আজকের রাতটা। রংচঙে চিনে মাটির পুতুলের উপমাটা মনে পড়লো। আশ্চর্য, মালতী সেনই বলেছিলো কথাটা।

সমাপ্ত